মেয়ারুল মাযাহেব

(ধর্মের মানদন্ড)

লেখক
হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর প্রতিষ্ঠাতা

মেয়ারুল মাযাহেব

(ধর্মের মানদন্ড)

প্রাকৃতিক মানদন্ডের নিরিখে ধর্মের একটি তুলনামূলক অধ্যায়ন

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

প্রকাশনায়
নাযারত নশর ও এশায়াত, কাদিয়ান, পঞ্জাব

মেয়ারুল মাযাহেব

লেখকের নাম	ঃ	হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)
বঙ্গানুবাদ	ঃ	রফিকুল ইসলাম এম.এ. (বাংলা), মুরুব্বী সিলসিলাহ্
প্রকাশক	ঃ	নাযারত নশর ও এশায়াত, সদর আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়া, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পঞ্জাব
সংস্করণ	ঃ	জানুয়ারী, ২০২৩ (ভারত)
সংখ্যা	ঃ	৫০০
মূদ্রণে	ঃ	ফজল-এ-ওমর প্রিন্টিং প্রেস, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পঞ্জাব

Title	**:**	**Miyarul Mazahib**
Author	**:**	**Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as)** **The Promised Messiah & Imam Mahdi**
Translator	**:**	**Rafikul Islam M.A. (Bangla), Murabbi Silsilah**
1st Edition	**:**	**January, 2023 (India)**
Copies	**:**	**500**
Published by	**:**	**Nazarat Nashr-o-Isha'at, Sadr Anjuman Ahmadiyya, Qadian, Gurdaspur, Punjab**
Printed at	**:**	**Fazle Umar Printing Press, Qadian, Gurdaspur, Punjab**

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

ভূমিকা

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী আলায়হেস্ সালাম রচিত অন্যন্য সাধারণ এই পুস্তিকাটি ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে উর্দু ভাষায় প্রথমবার প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাটি বাংলায় অনুবাদের দূরহ কাজটি সম্পাদন করেছেন জনাব রফিকুল ইসলাম এম. এ (বাংলা) মুরুব্বি সিলসিলা বাংলা ডেস্ক, কাদিয়ান। কম্পোজ সহ পুস্তিকাটির সেটিংও অনুবাদক স্বয়ং করেছেন। প্রুফ রিডিং এবং রিভিউ করেছেন জনাব মওলানা কাজী আয়াজ মুহাম্মদ মোয়াল্লেম সিলসিলা, জনাব মওলানা সেখ মোহাম্মদ আলী সেক্রেটারী এশায়াত কমিটি পশ্চিমবঙ্গ, জনাব মওলানা জাহিরুল হাসান ইনচার্জ বাংলা ডেস্ক, কাদিয়ান।

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) এর সদয় অনুমোদনে পুস্তিকাটির বাংলা অনুবাদ প্রথম সংস্করণ রূপে নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।

পুস্তিকাটির প্রকাশে সহযোগিতাকারী সকল কর্মকর্তাকে আল্লাহ্‌তা'লা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। আমিন

বিনীত

জানুয়ারী, ২০২৩ ইং

হাফিয মখদুম শরীফ

নাযির নশর ও এশায়াত কাদিয়ান

পুস্তক পরিচিতি

এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাটিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সহজাত গুণাবলীর মাপকাঠিতে বিভিন্ন ধর্মের তুলনা করেছেন। বিশেষ করে আর্য, খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মে খোদাতা'লা সম্পর্কে বর্ণিত শিক্ষামালার তুলনামূলক বর্ণনা করে তিনি (আ.) বলেন, প্রকৃত ও স্বভাবজ বিশ্বাস হল সেটা যা ইসলাম উপস্থাপন করে থাকে। এভাবেই তিনি অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য প্রমাণ করেছেন।

(মওলানা জালাল উদ্দিন শামস্)

লেখক পরিচিতি

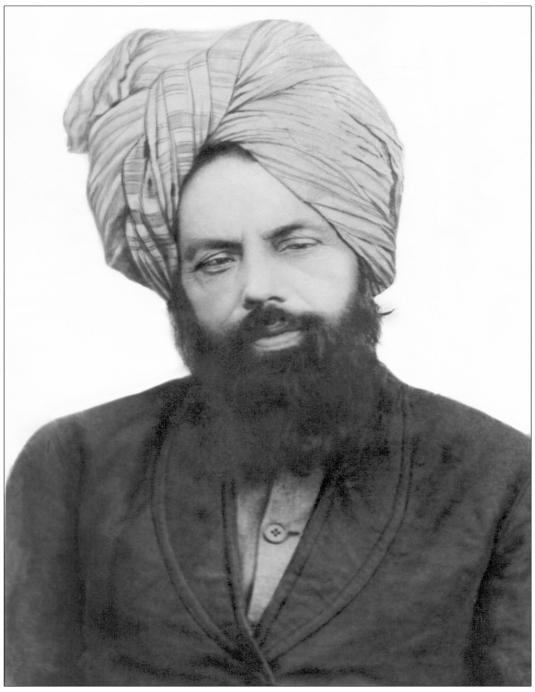

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী আলায়হেস সালাম,

[জন্ম ঃ ১২৫০ হিঃ ১৮৩৫ খৃ. মৃত্যু ঃ ১৩২৬ হিঃ ১৯০৮ খৃ.]

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী আলায়হেস্ সালাম ১৮৩৫ সনে ভারতের পঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজীবন পবিত্র কুরআন-এর গবেষণা ও মাহাত্ম্য অনুসন্ধান, দোওয়া ও একান্ত ধর্মপরায়ণ জীবন যাপন করেন। চারদিক হতে ইসলামের বিরুদ্ধে নোংরা অপবাদ,আক্রমণ, মুসলমানদের চরম অবনতি, নিজ ধর্ম-বিশ্বাসে সন্দেহ-সংশয় ও নামমাত্র ধর্ম পালন ইত্যাদি অবলোকন করে তিনি ইসলামের যথার্থ ও পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং ৯০টিরও অধিক পুস্তক রচনা করেন এবং সহস্রাধিক পত্রাবলী

ও বক্তৃতা, আলোচনা এবং ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাস) প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করে সাব্যস্ত করেন, ইসলাম-ই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম এবং একমাত্র এরই বিশ্বাসসমূহ ধারণ ও পালন করার মাধ্যমে মানবকুল তার পরম স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে এবং তাঁরই পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পারে। হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আ.) খুব অল্প বয়স থেকেই ঐশী স্বপ্ন, দিব্যদর্শন এবং প্রত্যাদেশগুলি অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। ঐশী আদেশে ১৮৮৯ সনে তিনি বয়া'ত গ্রহণ করা শুরু করেন এবং একটি পবিত্র জামা'ত-র ভিত্তি রাখেন। অতঃপর ঐশী প্রত্যাদেশ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে ঘোষণা করার আদেশ প্রদান করেন যে, তিনি তাঁকে পরবর্তীকালের জন্য সেই সংস্কারক হিসাবে নিযুক্ত করেছেন যার ভবিষ্যদ্বাণী বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে পূর্ব হতেই বিদ্যমান। তিনি (আ.) আরও দাবী করেন যে; তিনিই সেই মসীহ্‌ এবং মাহ্‌দী যাঁর আগমন সম্পর্কে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। জামা'ত আহমদীয়া এখন পৃথিবীর দুই শতাধিক দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে।

১৯০৮ সনে প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর কুরআন মজীদ এবং আঁ হযরত (সা.) র ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর এই ঐশী প্রচারকে পরিপূর্ণতা দান করার উদ্দেশ্যে খিলাফত ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠা হয়। হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'লা বেনাসরিহিল আযীয তাঁর (আ.) পঞ্চম খলীফা এবং নিখিল বিশ্ব জামা'ত আহ্‌মদীয়ার বর্তমান যুগ ইমাম।

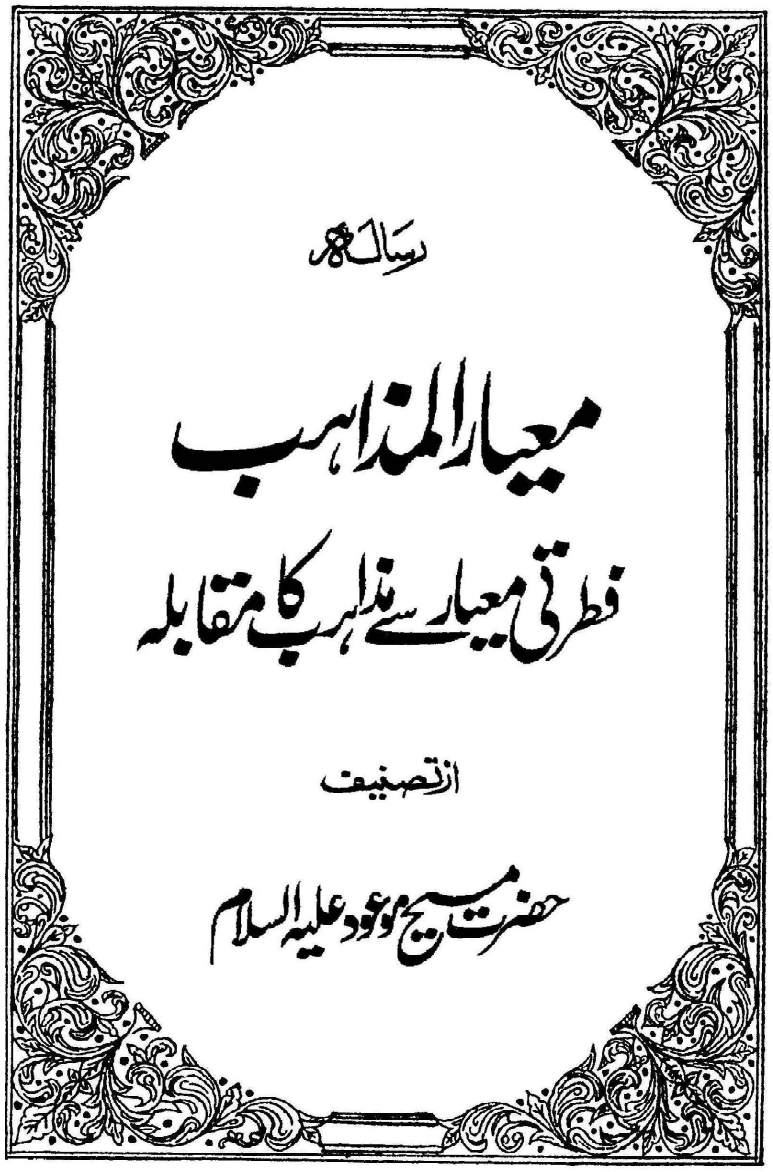

উর্দু প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ ১৮৯৫ খ্রি.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

স্বভাবজ বৈশিষ্ট্যের নিরিখে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে তুলনা ও ইংরেজ সরকারের উদারতার কতিপয় উল্লেখ

আমার মতে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যাচাই-বাছাই ও উত্তম-অধমের পার্থক্য নিরূপনের জন্য উত্তম সুযোগ এ দেশবাসী অপেক্ষা অন্য কারোর পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। যে সুযোগ আমাদের প্রদেশ পঞ্জাব তথা ভারতবর্ষ পেয়েছে। এমন সুযোগ প্রাপ্তির জন্য সর্বপ্রথম খোদাতা'লার অনুগ্রহ হল, আমাদের দেশে ব্রিটিশ সরকারের একছত্র শাসন ক্ষমতা। আমি একেবারেই অকৃতজ্ঞ ও অনুগ্রহের অস্বীকারকারী সাব্যস্ত হব যদি আমি আন্তরিকতার সহিত এই অনুগ্রহপরায়ন সরকারের কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করি, যার কল্যাণমন্ডিত সত্ত্বার জন্য ইসলামের প্রতি আমন্ত্রণ ও প্রচারের সৌভাগ্য অর্জন করেছি যা ইতোপূর্বে কোন বাদশাহ্ও অর্জন করেনি। কেননা এমন বাক্ স্বাধীনতা এই শিক্ষানুরাগী সরকার স্বয়ং প্রদান করেছে যার দৃষ্টান্ত বর্তমানে অন্য কোন সরকারের মধ্যে অন্বেষণ করা অনর্থক। এটি কি আশ্চর্যকর বিষয় নয় যে, ইসলামের সমর্থনে লন্ডনের বাজারে বসে আমি উপদেশ প্রদান করতে সক্ষম যা মক্কা শরীফেও এই সুযোগ পাওয়া অসম্ভব। এই সরকার পুস্তক প্রকাশনী ও ধর্ম প্রচারের জন্য কেবল সকল জাতিকেই স্বাধীনতা প্রদান করেনি বরং তারা স্বয়ং জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারের জন্য বিভিন্ন প্রকার সহায়তা করে চলেছে এবং শিক্ষা প্রদান করে বিশ্ববাসীর চক্ষু উন্মোচন করছে। যদিও দয়ার্দ্র সরকারের এই অনুগ্রহ কোন অংশে কম নয় যে, তারা আমাদের সম্পদ, সম্মান ও প্রাণের যথাসম্ভব সুরক্ষা করে চলেছে এবং সেই স্বাধীনতা দ্বারা আমাদের উপকার করে চলেছে যার জন্য

আমাদের পূর্বে মানবজাতির বহু প্রকৃত সহমর্মী ব্যক্তি কাঙ্ক্ষিত অবস্থায় ইহধাম ত্যাগ করেছেন। অধিকন্তু সরকারের এই দ্বিতীয় অনুগ্রহটি অতি উচ্চ মানের। তারা বন্য পশুসুলভ নামমাত্র মানুষদের প্রকৃতি ও চরিত্রকে বিভিন্নপ্রকার শিক্ষার আলোকে সুশিক্ষিত ও জ্ঞানদীপ্ত করতে চায়। আমি লক্ষ্য করছি যে, এই সরকারের ক্রমাগত প্রচেষ্টায় প্রায় গবাদি পশু ও চতুষ্পদ জন্তু সুলভ মানুষেরা মনুষ্যত্ব, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা হতে কিছু কিছু অংশ লাভ করেছে এবং অধিকাংশের হৃদয় ও মস্তিষ্কে এমন এক আলোকবর্তিকার উন্মেষ ঘটেছে যা শিক্ষা অর্জনের পরেই উন্মেষ ঘটে থাকে। জ্ঞানের ব্যাপ্তি যেন সহসা পৃথিবীকে বদলে দিয়েছে। কিন্তু যেরূপ কাঁচের মধ্যে দিয়ে আলো তো ঘরে প্রবেশ করে কিন্তু জল প্রবেশ করতে পারে না। অনুরূপভাবে শিক্ষার আলো তো হৃদয় ও মস্তিষ্কে প্রবেশ করেছে কিন্তু এখনও আন্তরিকতা ও সততা অর্জনের নিমিত্তে সেই পরিশুদ্ধ জল ভিতরে প্রবেশ করেনি যদ্বারা আত্মার চারা বৃক্ষ সতেজ হবে ও ফুলে ফলে সুশোভিত হবে। এটি সরকরের ভুল নয়। বরং এমন সামগ্রী আবিষ্কার হয়নি অথবা স্বল্প মাত্রায় বিদ্যমান যা প্রকৃত আধ্যাত্মিকতাকে উদ্বেলিত করবে। আশ্চর্যকর বিষয় হল, শিক্ষার উন্নতিতে মিথ্যা এবং প্রবঞ্চনারও কিছু উন্নতি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। সাধু-সজ্জনদের অসহনীয় শঙ্কার সম্মুখীন হতে হচ্ছে; ঈমানের সরলতা হ্রাস পেয়েছে; ধর্মীয় প্রজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন দার্শনিক ধারণা নব্য শিক্ষিত মানুষদের উপর বিষাক্ত প্রভাব ফেলছে যা নাস্তিকতার প্রতি আকর্ষিত করছে। ধর্মীয় শিক্ষার সহায়তা ব্যাতিরেকে এ হতে প্রভাব মুক্ত হওয়া অতীব দুঃসাধ্য ব্যাপার। সুতরাং এমন স্কুল ও কলেজে এরূপ অবস্থায় নিপতিত ব্যক্তিদের জন্য পরিতাপ! ধর্মীয় জ্ঞান ও বাস্তবতা সম্পর্কে তারা ওয়াকিবহাল নয়। হ্যাঁ, আমি বলতে পারি, মানবজাতির সহানুভূতিশীল এই উচ্চকাঙ্ক্ষী সরকার এই দেশবাসীর পতিত অবস্থায় পড়ে থাকা, জঙ্গলি গাছ-গাছালি, ঝোপ-ঝাড় ও বিভিন্ন প্রকার কন্টকাকীর্ণ লম্বা ও ঘন ঘাস দ্বারা আচ্ছাদিত হৃদয় ভূমিকে নিজ হস্ত দ্বারা পরিষ্কার করেছে। স্বভাবতই এখন সেই সময় উপস্থিত যখন এই ভূমিতে সত্যের বীজ বপন করা হবে। অতঃপর এর উপর ঐশী জল সিঞ্চন

করা হবে। সুতরাং সেই ব্যক্তিবর্গ অতীব সৌভাগ্যশীল যারা এই মঙ্গলাকাঙ্খী সরকারের মাধ্যমে ঐশী বারির সন্নিকটে পৌঁছে গেছে। এই সরকারের উপস্থিতিকে মুসলমানদের খোদাতা'লার অনুগ্রহ মনে করা উচিত এবং তার যথাযথ অনুসরণে প্রচেষ্টারত থাকা দরকার তা যেন অন্যদের জন্য নমুনা হয়ে দাঁড়ায়। দয়ার প্রতিদান কী দয়া নয়? পুণ্যের পুরবর্তে পুণ্য করা কী আবশ্যক নয়? সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিকে এ বিষয়ে চিন্তা করা ও স্বীয় উত্তম আদর্শ প্রদর্শন করা উচিত। ইসলামি শরীয়ত কোন ব্যক্তির অধিকার ও অনুগ্রহকে খর্ব করতে চায় না। অতএব কপটতার আশ্যয় নিয়ে নয় বরং সদ্‌চিত্তে এই অনুগ্রহপরায়ন সরকারের প্রতি অনুগত থাকা একান্ত প্রয়োজন। কেননা আমাদের ধর্মের আলো প্রসারের জন্য খোদাতা'লা সর্বপ্রথম এই উপলক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আমাদের দেশে ধর্মের সনাক্তকরণের জন্য আবিষ্কৃত দ্বিতীয় মাধ্যম হল, ব্যাপকহারে ছাপাখানার ব্যবহার। কেননা, এককথায় যে পুস্তকাবলী ভূ-গর্ভে সমাধিস্থ ছিল এই ছাপাখানার মাধ্যমে যেন তা পুনরায় জীবন ফিরে পেয়েছে। এমনকি হিন্দুদের বেদও নূতন পৃষ্ঠার পোশাকে আচ্ছাদিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এককথায় নব প্রজন্ম লাভ করেছে এবং নির্বোধ ও সাধারণের দ্বারা নির্মিত কাহিনীর রহস্য উন্মোচিত হয়েছে।

তৃতীয় মাধ্যম হল, যাতায়াতের সুব্যবস্থা, সুষ্ঠ ডাকব্যবস্থা, দূর-দূরান্তের দেশ হতে পুস্তকের এ দেশে আগমন এবং এ দেশ হতে ওই সকল দেশে গমণ। এগুলি হল সত্যান্বেষণের মাধ্যম যা খোদাতা'লার অনুগ্রহে আমাদের দেশে প্রবর্তন করা হয়েছে। যদ্বারা আমরা পূর্ণাঙ্গীনভাবে লাভবান হচ্ছি। এ সকল সুফল আমরা অনুগ্রহপরায়ন ও সহৃদয় সরকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছি। যে কারণে ব্যাকুল চিত্তে তাদের জন্য দোওয়া করি। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয়, তাহলে যে ধর্ম একজন মানুষকে খোদা বানিয়ে প্রকৃত সত্য চিরঞ্জীব খোদার অপরিবর্তনীয় এবং মহিমান্বিত মর্যদার অবমাননা করছে অতঃপর এমন সুসভ্য ও বিচক্ষণ সরকার কেন এমন ধর্মকে লালন করছে? সেহেতু আফসোস!

এর উত্তর কেবল এতটাই যে, রাজা-বাদশাহদের সাম্রাজ্য বিস্তারের চিন্তা মাত্রাতিরিক্ত বর্ধিত হয়। যে কারণে বিচার-বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও চিন্তাভাবনা করার সকল ক্ষমতা এর পিছনেই খরচ হয়ে যায় আর জাতীয় সুরক্ষার মঙ্গলসাধনের লক্ষ্যে পারলৌকিক বিষয়ের দিকে মনোযোগী হওয়ার সুযোগ পায় না । অনুরূপভাবে নিরবচ্ছিন্ন পার্থিবতার মোহে আচ্ছন্ন হওয়াতে খোদা অন্বেষণ ও সত্য স্বীকারের ক্ষমতাও লোপ পায়। যদিও আমরা খোদাতা'লার করুণা সম্পর্কে হতাশ নই যে, তিনি এই বাহাদুর সরকারকে সিরাতে মুস্তাকিমের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন না। এই সরকারের ইহলৌকিক উন্নতির জন্য যেমন আমাদের দোওয়া আছে তদ্রুপ পারলৌকিক উন্নতির জন্যও। অতএব অবাক হওয়ার কিছু নেই যদি আমরা দোওয়ার সুপ্রতিফল দেখতে পাই!

এযুগে যেখানে সত্য-মিথ্যা যাচাই বাছাইয়ের জন্য বহু মাধ্যমের উদ্ভব হয়েছে। সেখানে এ দেশে তিনটি বড় ধর্ম প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য দন্ডায়মান হয়ে এক অপরকে টক্কর দিচ্ছে। এই তিন ধর্মের মধ্যে প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের দাবী হল, আমার ধর্ম সত্য ও সঠিক। আশ্চর্যকর বিষয় হল, কেউই স্বীকার করতে প্রস্তুত নয় যে, তাদের ধর্ম সততার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নেই। যেরূপ আমি আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের মৌখিক দাবীর প্রতি আশ্বস্ত নই। সেরূপ এক মুহূর্তের জন্যও তাদের হৃদয় ও তাদের মৌখিক দাবির সঙ্গে সহমত প্রদর্শন করে না। যদিও সত্য ধর্মের দলিল আমি বর্ণনা করব তার পূর্বে (বলে রাখি) সত্য ধর্ম নিজ সত্তায় এরূপ জ্যোতির্ময় ও সমুজ্জ্বল যদি তার প্রতিপক্ষতায় অন্যান্য ধর্মগুলিকে যাচাই বাছাই করা যায় তাহলে সবগুলি তমসাচ্ছন্ন বলে মনে হবে। একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি এই দলিল প্রমাণাদিকে তখনই সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে যখন প্রত্যেক ধর্মে নবোদ্ভাবিত এহেন প্রমাণাদিকে পৃথক করে কেবল মূল নীতিমালার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে। অর্থাৎ ঐ সকল ধর্মের খোদা অন্বেষণের পন্থাকে একে অপরের প্রতিপক্ষতায় রেখে পর্যালোচনা করুন এবং কোন ধর্মের খোদা অন্বেষণের বিশ্বাসের উপর বাহ্যিক দলিল প্রমাণাদির টীকা টীপন্নি সংযোজন করবেন না। বরং সকল দলিল প্রমাণাদিকে পৃথক পৃথক রেখে এক ধর্মের সঙ্গে

অন্য ধর্মের পর্যলোচনা করুন এবং চিন্তা করুন, কোন ধর্মের মধ্যে স্বীয় সত্যতার জ্যোতি চমকিত হচ্ছে। আর কোন ধর্মের মধ্যে বিশেষত্ব রয়েছে যে, তাদের খোদা অন্বেষণের পন্থার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে তা হৃদয়কে আকর্ষিত করে। অর্থাৎ যে তিন ধর্মের কথা আমি উল্লেখ করেছি তা হল, আর্য, খ্রিস্টান ও ইসলাম। আমরা যদি এই তিন ধর্মের আসল প্রতিচ্ছবি দেখাতে চাই তাহলে তার বিবরণ নিম্নরূপ :

আর্য ধর্মের ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব স্বীয় শক্তি ও সামর্থে ক্রিয়াশীল থাকা অসম্ভব। তার সকল আশা ভরসা এমন অস্তিত্ত্বের উপর নির্ভরশীল যাকে সে নিজের হাতে সৃষ্টিও করেনি। প্রকৃত খোদার শক্তি ও সামর্থের জ্ঞানের পরিধি আয়ত্ব করা কোন মানুষের কর্ম নয়। কিন্তু আর্যাবর্তের ঈশ্বরের ক্ষমতা হাতে গণনা করা সম্ভব। তিনি এমন পরিমিত ক্ষমতাবান পরমেশ্বর যে, তার সমস্ত ক্ষমতার গন্ডি জানা হয়ে গেছে। তার ক্ষমতার উচ্চ প্রশংসায় কেবল এতটুকু বলা যথেষ্ট হবে যে, তিনি নিজের মতো প্রাচীন বস্তুগুলিকে কেবল মিস্ত্রির ন্যায় জোড়া তালি দিতে সক্ষম। আর যদি জিজ্ঞাসা করেন নিজের পক্ষ থেকে কী কিছু সংযোজন করেন? তাহলে আফসোসের সঙ্গে বলতে হবে, কিছুই না। মোট কথা তার শক্তির চরম সীমা হল, তার ন্যায় প্রাচীন, অনাদি, অবিনশ্বর আত্মা ও দেহ যাদের সৃষ্টির ব্যাপারে তার নিজের কোন প্রভাব প্রতিপত্তি নেই তাদের পরস্পরকে কেবল জোড়া তালি লাগাতে সক্ষম। কিন্তু এ কথার কোন প্রমাণ উপস্থাপন করা খুবই কঠিন যে, এমন পরমেশ্বরের কি দরকার যে ঐ প্রাচীন সত্তাবলীর যারা অনাদি, যাদের সকল শক্তি স্বয়ং নির্মিত, একে অপরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ক্ষমতা নিজেদের রয়েছে, যাদের আদি হতেই আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ক্ষমতা বিদ্যমান, সংযুক্তির পর তাদের সকল গুণাবলী স্বয়ং প্রকাশিত হয়। সুতরাং বুঝতে পারছি না, তাহলে কোন যুক্তিতে এই অযোগ্য দুর্বল পরমেশ্বরের প্রয়োজন প্রমাণিত হয়? তিনি ভিন্ন অন্যান্যদের মাঝে অধিক বিচক্ষণতা ও বুদ্ধির দৃষ্টিকোণ হতে কী'ই বা পার্থক্য বিদ্যমান? এর মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, আর্যাবর্তের পরমেশ্বর ঈশ্বরত্বের অসীম ক্ষমতার চরম সীমা অর্জনে অক্ষম। এই কাল্পনিক পরমেশ্বরের দুর্ভাগ্য হল,

ঈশ্বরত্বের পূর্ণ মাহাত্ম্য উন্মেষিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় স্বয়ং সম্পূর্ণতা তার ভাগ্যে জোটে নি। দ্বিতীয় দুর্ভাগ্য হল, বেদের কয়েক পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি ছাড়া প্রাকৃতিক উপায়ে তার সনাক্তকরণের কোন পদ্ধতি নেই। কেননা, এ কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে যে সকল আত্মা ও অণু-পরমাণু স্বীয় সমস্ত শক্তি, আকর্ষন ক্ষমতা, বৈশিষ্ট্যাবলী,বুদ্ধি, অনুভূতি ও চেতনা শক্তি সহকারে অনাদি হয় তাহলে কোন সুবিচক্ষণ ব্যক্তি এগুলোকে সংযুক্তকরণের জন্য অন্য কোন ব্যক্তির প্রয়োজন বোধ করে না। এমতাবস্থায় এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে যে, যে বস্তু আদি হতেই নিজ অস্তিত্বের স্বয়ং স্রষ্টা, পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতা তার মধ্যে বিদ্যমান, তাদের অস্তিত্বের জন্য কোন পরমেশ্বরের দরকার হয় নি, স্বীয় ক্ষমতা ও বিশেষত্বের জন্য যখন কোন নির্মাণকারীর মুখাপেক্ষী হতে হয় নি, তাহলে কী কারণে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্তির জন্য ভিন্ন কোন সংযোগকারীর প্রয়োজন হয়ে পড়ল? যদিও আত্মার সঙ্গে তাদের শক্তির একাত্মতা ও অনু-পরমাণুর সঙ্গে তাদের বৈশিষ্ট্যের সম্পৃক্ততাও এক প্রকারের সংযুক্তিকরণ। অতএব এ কথা হতে প্রমাণিত যে, ঐ আদি বস্তুগুলির ক্ষেত্রে যেমন তাদের নিজ অস্তিত্বের জন্য কোন স্রষ্টার প্রয়োজন নেই এবং তাদের নিজ শক্তির জন্য করোর উপস্থিতির দরকার নেই, তেমনই পরস্পরের সংযুক্তির জন্যও কোন নির্মাতার প্রয়োজন নেই। প্রথমেই আপনারা যখন নিজের মুখ থেকেই স্বীকার করেছেন যে, তারা নিজেদের অস্তিত্ব ও ক্ষমতার নিজেরাই মালিক ও নিজেদের মধ্যে পরস্পর জোড়া লাগার জন্য অন্য কারোর মুখাপেক্ষী নয় অতঃপর সেই মুখ থেকেই বলছেন, কতিপয় বস্তুর জোড়া লাগার জন্য অবশ্যই ভিন্ন কোন সত্তার প্রয়োজন- এমন বলা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। যাইহোক এ তো এক যুক্তি বিহীন দাবি মাত্র। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করাই দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে। সুতরাং সেই ব্যক্তির থেকে দূর্ভাগা আর কেউ নেই, যে এমন পরমেশ্বরের উপর আস্থা রাখে, দুর্বলতার কারণে যার স্বীয় অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য উত্তম পন্থা লব্ধ হয় নি। এই হল হিন্দু ধর্মের পরমেশ্বরের ঐশ্বরিক ক্ষমতা আর চারিত্রিক গুণাগুণের অবস্থা

যে, তাকে (পরমেশ্বর) মানবীয় গুণাবলী হতেও কিছুটা নিম্নমানের বলে মনে হয়। যাইহোক আমরা দেখেছি, একজন সচ্চেতা মানুষ বহুবার অনুনয় বিনয়ের সঙ্গে ক্ষমাপ্রার্থি ব্যক্তির ত্রুটি মার্জনা করে দেন এবং স্বীয় দয়াদ্রচিত্ততার বলে এমন লোকেদের প্রতি বহুবার অনুগ্রহ প্রদর্শন করে থাকেন যারা অনুগ্রহের যোগ্যও নয়। অধিকন্তু আর্যসমাজিরা তাদের পরমেশ্বর সম্পর্কে বর্ণনা করেন, তাদের পরমেশ্বর উভয় প্রকার চারিত্রিক গুণাবলী হতেও বঞ্চিত। তাদের মতে প্রত্যেক পাপ হল কোটি কোটি জন্মান্তরের কারণ। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন পাপাচারি ব্যক্তি অজস্র বার জন্মান্তরিত হয়ে সম্পূর্ণ শাস্তি গ্রহণ না করে ততক্ষণ শুদ্ধতার কোন উপায় নেই। তাদের ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী এই আশা একেবারেই অনর্থক যে, মানুষের তওবা, অনুশোচনা ও ইস্তেগফার তাদের পুণর্জন্ম লাভের পথকে রুদ্ধ করবে অথবা সত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তন তাদের বিগত অন্যায় কথা ও কর্মের শাস্তি হতে রক্ষা করবে। বরং অজস্রবার পুণর্জন্ম তাকে ভোগ করতে হবে যা অটল ও অমোঘ। উদারতা ও বদান্যতা বশতঃ সামান্য ক্ষমা করাও পরমেশ্বরের গুণাবলী নয়। কোন মানুষ ও পশুর মধ্যে যদি কোন উত্তম গুণাবলী থেকে থাকে বা কোন কল্যাণ অর্জন করে তাহলে সেটা তার কোন পূর্বজন্মের ফল। পরিতাপ! এতদ্সত্ত্বেও আর্যগণ বেদের রীতি-নীতি সম্পর্কে গর্বিত হয়। তথাপি বেদের এই ভ্রান্ত শিক্ষা তাদের মনুষ্য বিবেককে বিচলিত করেনি। এই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে অধিকাংশ সময় আমি অনুভব করেছি, যেমন 'নিয়োগ'-এর উল্লেখের সময় লজ্জায় আর্যদের মাথা নত হয়। ঠিক তেমনই লজ্জিত হয় যখন প্রশ্ন করা হয় যে, পরমেশ্বরের প্রাকৃতিক ও চারিত্রিক গুণাগুণগত এত সীমাবদ্ধতা কেন যে দুর্ভাগ্যের কারণে যৌক্তিকভাবে তার ঈশ্বরত্বও প্রমাণিত হয় না? যে কারণে দুর্ভাগা আর্যেরা চির মুক্তি অর্জনে বঞ্চিত? অতএব হিন্দুদের পরমেশ্বরের যথার্থ বাস্তবতা হল, তিনি চারিত্রিক ও ঐশ্বরিক গুণে যথেষ্ঠ দুর্বল ও করুণার যোগ্য। সম্ভবত এজন্যই বেদে পরমেশ্বরের উপাসনা পরিত্যাগ করে অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য এবং জলের উপাসনার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। সকল অনুগ্রহ ও মার্জনা তাদের কাছেই

যাচনা করা হয়। কেননা পরমেশ্বর যখন আর্যদের উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিতে অক্ষম, বরং তিনি নিজেই পূর্ণ ক্ষমতা হতে বঞ্চিত থাকার কারণে হতাসাগ্রস্থ অবস্থায় দিনাতিপাত করছেন, তখন অন্যদের তার উপর নির্ভর করা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি মাত্র। জনসমক্ষে হিন্দু ধর্মের পরমেশ্বরের পূর্ণ স্বরূপ উপস্থাপনের জন্য আমি যা উল্লেখ করেছি তা যথেষ্ঠ।

দ্বিতীয় ধর্ম হল, **খ্রিস্ট ধর্ম**। এর সমর্থনকারীরা বড়ই উৎফুল্লতার সঙ্গে যীশু মসীহ্ নামি তাদের স্বঘোষিত খোদাকে অতিরঞ্জিতভাবে সত্য খোদা মনে করে থাকে। খ্রিস্টিয় খোদার চিত্র হল, তিনি একজন ইস্রাঈলী পুরুষ, ইয়াকুব কন্যা মরিয়মের পুত্র। যিনি ৩২ বছর বয়সে ইহ জগৎ পরিত্যাগ করেছেন। যখন আমি চিন্তা করি যে, গ্রেফতারের সময় সারা রাত দোওয়ার পরও কেনই বা তাঁর ইচ্ছা পূরণ হয় নি ও তিনি লাঞ্ছিতভাবে ধৃত হলেন! খ্রিস্টানদের বিশ্বাসানুযায়ী তাঁকে ফাঁসি কাঠে ঝোলানো হয় এবং তিনি এলি! এলি!* (হে আমার প্রভু! হে আমার প্রভু!) স্মরণ করতে করতে মারা যান। কখনো কখনো তো আমার শরীর কম্পিত হয়ে ওঠে, যে ব্যক্তির দোওয়া গৃহীত হল না, একবারে হতাশ ও অপ্রসন্ন অবস্থায় মার খেতে খেতে মারা গেল তাকে কি প্রভাব প্রতিপত্তিশালী খোদা বলা যায়? সেই সময়ের চিত্রও একটু দৃষ্টিপটে এনে দেখুন যখন যীশু মসীহ্ গ্রেফতার অবস্থায় পিলাতের আদালত হতে হেরোদের দিকে প্রেরিত হয়েছিল! এ কী খোদার মর্যাদা? গ্রেফতার হয়ে, হাতে হাতকড়ি ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে, কতিপয় সিপাহীর বন্ধনে অবরুদ্ধ অবস্থায় তিরস্কৃত হতে হতে গালিলের দিকে রওনা দিয়েছিল! এমন লাঞ্ছনাজনক পরিস্থিতিতে এক জেল হতে অন্য জেলে তাঁকে পৌঁছাল! অলৌকিকত্ব দেখার পর পিলাতুস তাঁকে মুক্তি প্রদান করতে চেয়েছিল। কিন্তু তখন তিনি অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করতে পারেন নি। অগত্যা বন্দি অবস্থায় তাঁকে পুনরায় ইহুদিদের নিকট হস্তান্তর করতে হল। আর তারা এক নিমিষেই তাঁর জীবন প্রদীপ নির্বাপিত করল।

এখন পাঠকগণ অনুভব করুন, প্রকৃত ও যথার্থ খোদার গুণাবলী

* মতি ২৭:৪৬ -প্রকাশক

কি এমন হয়? কোন সুবিবেচক ব্যক্তি কি একথা গ্রহণ করতে পারবে যে, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ও অসীম শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী অবশেষে তাঁর এমন দুর্ভাগ্য, দুর্বল ও লাঞ্ছনাকর পরিস্থিতি হবে যে দুষ্কৃতিপরায়ন ব্যক্তিরা তাঁকে নিজেদের হাতে পিষে ফেলবে? এখন কেউ যদি এমন খোদার পূজা ও তার উপর আস্থা রাখতে চায় রাখতে পারে। কিন্তু সত্য কথা হল, আর্যদের পরমেশ্বরের প্রতিপক্ষতায় যদি খ্রিস্টানদের খোদাকে দাঁড় করিয়ে তার শক্তি ও ক্ষমতাকে ওজন করা যায় তথাপি তার সামনে একবারেই নিম্ন মানের প্রতিপন্ন হয়। কেননা, আর্যদের কাল্পনিক খোদা যদিও সৃষ্টি করতে অক্ষম, কিন্তু বলা হয়ে থাকে যে তিনি সৃষ্ট বস্তুদেরকে সংযুক্তিকরণে সক্ষম। অধিকন্তু খ্রিস্টিয় মসীহ্‌র তো এই ক্ষমতাটুকুও প্রমাণিত হয় নি। ক্রুশে ঝোলানোর সময় ইহুদিরা বলেছিল, **এখনও যদি তুমি নিজেকে বাঁচাতে পার তাহলে আমরা তোমার উপর ঈমান আনয়ন করব।** তাদের সামনে তিনি নিজেকে বাঁচাতে পারেন নি। নতুবা তাঁর নিকট নিজেকে বাঁচানো এমন কোন বড় ব্যাপার ছিল না। কেননা, **কেবল নিজের শরীরের সঙ্গে আত্মার মেলবন্ধনের মাধ্যমেই তা সম্ভব হত।** অতএব এই দুর্বলের তো জোড়ারও ক্ষমতা নেই। তাঁর অনুপস্থিতিতে লোকেরা মনগড়া কথা বলতে শুরু করল যে, তিনি কবরে জীবিত হয়েছিলেন। কিন্তু পরিতাপ! তারা ভেবে দেখেনি যে, ইহুদিদের তো যাচনা ছিল, আমাদের সম্মুখে জীবিত হয়ে দেখাও। অতঃপর যখন তাদের সম্মুখে জীবিত হতে পারেন নি আর না তিনি কবরে জীবিত হয়ে এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, সেক্ষেত্রে ইহুদিদের নিকট বরং আপামোর গবেষকদের নিকট একথার প্রমাণ কী যে তিনি বাস্তবেই জীবিত হয়েছিলেন? যতক্ষণ প্রমাণ না পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ যদি ধরেও নেওয়া হয় যে কবরে পার্থিব দেহ অদৃশ্য হয়ে গেছে, তাহলে এ হতে তো জীবিত হওয়া প্রমাণিত হতে পারে না। বরং যৌক্তিকভাবে এটাই প্রমাণিত হবে যে, হয়ত কোন কেরামত (অলৌকিক নিদর্শন) প্রদর্শনকারী গোপনে লাশ চুরি করে নিয়ে গেছে। পৃথিবীতে এমন বহু মানুষ আগমন করেছেন, তাদের সম্প্রদায় ও বিশ্বাসীদের ধারণা ছিল যে, তার(তাদের গুরুর- অনুবাদক)

শব অদৃশ্য হয়ে স্বশরীরে জান্নাতে পৌঁছে গেছে, তাহলে খ্রিস্টানরা কী মান্যতা প্রদান করবেন যে, বাস্তবে এমনই হয়তো ঘটে থাকবে? উদাহরণস্বরূপ বেশি দূরে যেতে হবে না, বাবা নানক সাহেবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, সতেরো লক্ষ শিখ একমত যে, বাস্তবেই মৃত্যুর পর তিনি (বাবা নানক সাহেব) স্বশরীরে জান্নাতে পৌঁছে গেছেন। কেবল একমতই নয় বরং সে যুগে মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হওয়া নির্ভরযোগ্য পুস্তকগুলিতে একথা লেখা রয়েছে। এখন খ্রিস্টান ভদ্র মহোদয়গণ কি বিশ্বাস করবেন যে বাস্তবেই বাবা নানক সাহেব স্বশরীরে জান্নাতে পৌঁছে গিয়েছেন? আফসোস! খ্রিস্টানদের তো অন্যদের জন্য দর্শন মনে পড়ে যায়। কিন্তু নিজের ঘরের অযৌক্তিক চিন্তধারার বিষয়ে দর্শনকে স্পর্শও করতে দেয় না। খ্রিস্টান ভদ্র মহোদয়গণ যদি ন্যায়ের দৃষ্টিতে বিচার করতে চান তাহলে সহজেই বুঝতে পারবেন যে, বাবা নানক সাহেবের দেহ অদৃশ্য হওয়া এবং স্বশরীরে জান্নাতে পৌঁছে যওয়া সম্পর্কে শিখ সাহেবদের যুক্তি খ্রিস্টানদের উদ্ভট কাহিনী অপেক্ষা অনেক যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণীয় এবং নিঃসন্দেহে ইঞ্জিলের যুক্তি অপেক্ষা অধিক আকর্ষণীয়। কেননা, প্রথমত (বাবা নানক সাহেবের স্বশরীরে স্বর্গবাসের- অনুবাদক) ওই ঘটনা সেই সময়েই বালা জনম সাখিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু ইঞ্জিল মসীহ্‌র যুগের বহু বছর পর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অতঃপর বাবা নানক সাহেব সংক্রান্ত ঘটনার আরও একটি প্রাধান্যতা হল, যীশু মসীহ্‌র প্রতি আরোপিত অলৌকিকতা বাস্তবে সেই লাঞ্ছনাকে পর্দাবৃত রাখার অপচেষ্টা বলে মনে হয় যা ইহুদিদের নিকট হাওয়ারীদেরকে হতে হয়েছিল। কেননা, ইহুদিরা মসীহ্‌কে ক্রুশবিদ্ধ করার পর মো'জেযা দেখতে চেয়েছিল যে, এখনও যদি তিনি জীবিতাবস্থায় ক্রুশ হতে পরিত্রাণ পান তাহলে তারা তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করবে। সেই মুহূর্তে মসীহ্ ক্রুশ হতে পরিত্রাণ পান নি। সেকারণে মসীহ্‌র শিষ্যদের বহু লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তারা ইহুদিদের সামনে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছিল না। তাই সেই লজ্জা নিবারণের জন্য কোন অজুহাত অনুসন্ধান করা তাদের জন্য একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। যদ্বারা তারা সহজ সরল মানুষদের

দৃষ্টিতে এই অভিসম্পাত ও হাসি-বিদ্রুপ হতে রক্ষা পেতে পারত। সুতরাং বিবেক এ কথাকে স্বীকৃতি প্রদান করে যে, কেবল লজ্জার কলঙ্ক মুখ হতে পরিত্রান লাভের উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ তারা এই ছলনার আশ্রয় নিয়েছিল, যেমনটা তাদের উপর আরোপিত অভিযোগ অনুযায়ী হয়তো তারা রাতের বেলা কবর হতে দেহ বের করে অন্য কবরে স্থানান্তর করে। অতঃপর 'খোয়াজা কা গাওয়াহ ডাড্ডু' (অর্থাৎ নিজেদের দাবির একমাত্র সাক্ষ্যি-অনুবাদক) এই বিখ্যাত প্রবাদ বাক্যের ন্যায় বলেছিল, এই নাও তোমাদের আবেদন অনুযায়ী যীশু জীবিত হয়েছেন এবং অবিলম্বে তিনি স্বর্গে চলে গেছেন। বাবা নানকের মৃত্যুর সময় শিখ সাহেবদের কিন্তু এমন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি আর কোন শত্রুপক্ষ এরূপ অভিযোগ উত্থাপন করে নি আর না কোন প্রবঞ্চকের জন্য এরূপ করার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছিল। আর নাই বা লাশ চুরি হয়েছে বলে ইহুদিদের ন্যায় কেউ চিৎকার চেঁচামেঁচি করেছিল। সুতরাং খ্রিস্টানরা যদি যীশুকে ছেড়ে বাবা নানক সাহেব সম্পর্কে এই বিশ্বাস পোষণ করত তাহলে তা অধিক যুক্তিসঙ্গত হত। যীশু সম্পর্কিত এরূপ চিন্তাধারা সম্পূর্ণ কৃত্রিমতা ও প্রতারণার দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ।

পরিশেষে যীশুর দুঃখভোগ ও ক্রুশবিদ্ধ সম্পর্কে বাহানা উপস্থাপন করে বলে, তিনি খোদা হয়ে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন যাতে তাঁর মৃত্যু পাপাচারীদের প্রায়শ্চিত্তের কারণ হয়। 'খোদাও মারা যান'-এ কথাও খ্রিস্টানদের আবিষ্কার। এক কথায় তারা তাঁকে মেরে অতঃপর জীবিত করে ঐশী সিংহাসন 'আরশ মহল্লায়' পৌঁছে দিয়েছে এবং এই মিথ্যা ধারণায় আজও লিপ্ত যে, পুনরায় তিনি বিচারের জন্য পৃথিবীতে আগমন করবেন এবং মৃত্যুর পর পুনরায় তিনি যে শরীর প্রাপ্ত হয়েছেন ঈশ্বরত্বের কারণে উক্ত শরীর সর্বদা তাঁর সঙ্গে বিদ্যমান থাকবে। কিন্তু খ্রিস্টানদের এই সাকার খোদা তাদের ধারণানুযায়ী তিনি একবার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছেন, তিনি রক্ত-হাড়-মাংস সহযোগে সকল প্রকার অঙ্গপ্রতঙ্গেরও অধিকারী। এই চিন্তাধারা হিন্দুদের সেই অবতারগণের সমতুল্য যাদেরকে আর্যসমাজীগণ বর্তমানে বড়োই আনন্দের সঙ্গে তাদেরকে পরিত্যাগ করে চলেছে। পার্থক্য কেবল এতটাই যে,

খ্রিস্টানদের খোদা মাত্র একবার ইয়াকুব কন্যা মরিয়মের গর্ভ হতে জন্ম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু হিন্দুদের খোদা বিষ্ণু পৃথিবীর পাপমোচনের জন্য মোট নয় বার জন্ম গ্রহণের কলঙ্ক শিরোধার্য করেছেন। বিশেষকরে অষ্টমবার জন্মের এক চিত্তাকর্ষক কাহিনী বর্ণনা করা হয়ে থাকে। বলা হয়, পৃথিবী যখন দানবীয় শক্তির ফলে পরাজিত, তখন মাঝ রাতে বিষ্ণু এক কুমারী মহিলার গর্ভ হতে জন্ম নিয়ে অবতারত্ব গ্রহণ করেন এবং যে পাপ পৃথিবীকে গ্রাস করেছিল তা হতে মনুষ্য জাতিকে উদ্ধার করেন। যদিও এই কাহিনী খ্রিস্টানদের রুচির সমতুল্য। তবে এ ব্যাপারে হিন্দুগণ চরম বিচক্ষণতা প্রদর্শন করেছে, খ্রিস্টানদের ন্যায় তারা নিজেদের অবতারগণকে ক্রুশবিদ্ধ করে নি আর না তাদের অভিশপ্ত হওয়াতে বিশ্বাসী। কুরআন শরীফের কতিপয় ইঙ্গিত দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, আর্যাবর্তের ব্রাহ্মণরাই হল সর্বপ্রথম মানুষকে খোদা বানানোর উদ্ভাবক। অতঃপর একই চিন্তাধারা গ্রীকবাসীরা হিন্দুদের নিকট হতে গ্রহণ করে। অবশেষে এই অপ্রীতিকর বিশ্বাসে এই দুই সম্প্রদায়ের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণকারী হয় খ্রিস্টানরা। আরও এক সদূরপ্রসারী চিন্তা হিন্দুদের মন-মস্তিষ্কে উদিত হয়েছিল যা খ্রিস্টানদের মস্তিষ্কে আসেনি তা হল, হিন্দুগণ তাদের আদি অনন্ত ঐশ্বরিক নিয়মে এই কথাকে অন্তর্ভুক্ত বলে জ্ঞান করেন যে, যখনই পৃথিবী পাপাচারে পূর্ণ হয়েছে তখনই তাদের পরমেশ্বরের পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে মানুষদের মুক্তি দেওয়ার ভাবনা উদয় হয়। এমন ঘটনা কেবল একবার ঘটেনি বরং প্রয়োজনে বারংবার পুনরাবৃত্তি হয়ে এসেছে। যদিও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, খোদা আদি ও অনন্ত; অতিতে আপনি যতই পিছিয়ে যাবেন সেই সত্তার সূচনা খুঁজে পাবেন না যে, আদি হতে তিনিই সৃষ্টিকর্তা, প্রভু ও বিশ্বজগতের প্রতিপালক। কিন্তু তারা এ কথা বিশ্বাস করে না যে, আদি হতেই তিনি স্বীয় প্রিয় পুত্রগণকে ক্রুশবিদ্ধ করে আসছেন। বরং যুক্তি উপস্থাপন করে যে, এই উপায় কিছু কাল পূর্বেই উপলব্ধি হয়েছে আর বর্ষীয়ান পিতার মনে হয়েছে পুত্রকে ক্রুশবিদ্ধ করে সকলকে আযাব হতে রক্ষা করা যাক। স্পষ্ট প্রতীয়মান বিষয় হল, খোদাকে যদি আদি ও অনন্ত স্বীকার করতে হয় তাহলে একথাও মানতে হবে যে, আদি গুণে গুণান্বীত

হওয়ার কারণে তাঁর সৃষ্টকূলও অনন্তকাল ব্যাপি বিরাজমান এবং আদি গুণের অতীত মাহাত্ম্যবলীর কারণে কখনও একটি জগৎ সম্ভাব্য অনস্তিত্বে বিলুপ্ত হয়ে চলে এসেছে আবার কখনও তার স্থলে ভিন্ন একটি জগৎ অস্তিত্ব ধারণ করেছে। খোদাতা'লা পৃথিবীতে কতক সৃষ্টির স্থলে অন্য সৃষ্টির প্রতিষ্ঠা করেছেন এর গণনা কেউই করতে পারবে না। আমি আদম সৃষ্টির পূর্বে জ্বীন সৃষ্টি করেছিলাম– আল্লাহ্তা'লা কুরআন শরীফে এ কথা বর্ণনা করে আদি সৃষ্টিকূলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আদি সৃষ্টিকূলের প্রকরণ বাধ্যতামূলক এ কথার উজ্জ্বল প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও খ্রিস্টান সম্প্রদায়গণ কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন সূচি উপস্থাপন করে নি যদ্বারা প্রতীয়মান হবে যে, ঐ সীমাহীন জগতে যখন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল তখন ঈশ্বরপুত্র কতবার ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিল। কেননা, একথা তো স্পষ্ট যে, খ্রিস্ট ধর্মের মূল নীতির কারণে ঈশ্বর পুত্র ব্যতিরেকে কেউই পাপ হতে মুক্ত নয়। এমতাবস্থায় প্রশ্ন ওঠে, তাহলে আমাদের এই আদম হতে পূর্বে গত হওয়া সৃষ্টিকূল যাদের সঙ্গে এই আদম সন্তানদের ধারার কোন সম্পর্ক নেই তাদের পাপমোচনের জন্য কি ব্যবস্থা করা হয়েছিল? তাদের মুক্তির উদ্দেশ্যে কী এই পুত্রকে পূর্বেও কয়েকবার ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল? না কি অন্য কোন পুত্র সন্তান ছিল যে পূর্বের সৃষ্টিকূলের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হতে থাকে? আমার ধারণায়, ক্রুশ ছাড়া যদি পাপমোচন সম্ভবপর না হয় তাহলে খ্রিস্টিয় খোদার অগুন্তি পুত্র সন্তান ছিল যারা সময় বিশেষে রণাঙ্গনে কাজে লেগেছিল। আর প্রত্যেককে নিজ নিজ সময়ে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। অতএব স্বীয় যুবক সন্তানদের হত্যাকারী খোদার নিকট কোন কল্যাণের আশা রাখা অনর্থক।

অমৃতসরেও আমি এই প্রশ্ন করেছিলাম, খ্রিস্টানগণ স্বীকার করেন যে, তাদের খোদা কাউকে পাপের কারণে ধ্বংস করতে চান না। এমতাবস্থায় তাদের উপর এই অপবাদ আরোপিত হয় যে, সেই খোদা ইঞ্জিলে উল্লেখিত ঐ সকল শয়তানের অপবিত্র আত্মাগুলির মুক্তির কি

ব্যবস্থা করেছেন?* এমন কোন পুত্রের কী পৃথিবীতে আগমন ঘটেছে যে শয়তানের পাপ মোচনের জন্য নিজ প্রাণ বলিদান দিয়েছেন? অথবা শয়তানদেরকে পাপাচার থেকে পৃথক রেখেছেন? যদি এমন কোন ব্যবস্থা না থেকে থাকে তাহলে প্রমাণিত হয়, খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিশ্বাসানুযায়ী মানবজাতি হতে সংখ্যায় অধিক শয়তানেরা সর্বদা জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকুক–এটাই খ্রিস্টিয় খোদার অভিপ্রায়। অতঃপর যখন এমন কোন পুত্রের নিদর্শন উপস্থাপন করেনি এমতাবস্থায় খ্রিস্টানগণ মানতে বাধ্য যে, তাদের খোদা শয়তানদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন। মোটকথা বেচারা খ্রিস্টানগণ যখন থেকে মরিয়ম পুত্রকে খোদার আসনে উপবিষ্ট করিয়েছেন তখন থেকে তাদেরকে বড়ো বড়ো বিপদাবলীর সম্মুখীন হতে হয়েছে। এমন কোন দিন অতিবাহিত হয়নি যখন তাদের আত্মা তাদের এই বিশ্বাসকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে নি। অতঃপর তাদেরকে

---

* টীকা: ইসলামি শিক্ষা হতে প্রমাণিত শয়তানরাও ঈমান আনয়ন করে। সুতরাং আমাদের নেতা ও মনিব নবী (সা.) বলেন, আমার শয়তানও মুসলমান হয়ে গেছে। মোটকথা প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে একটি করে শয়তান থেকে থাকে। পবিত্রতা অর্জনকারী ও (ঐশী) নৈকট্যপ্রাপ্তগণের শয়তান ঈমান আনয়ন করে। কিন্তু পরিতাপ! যীশুর শয়তান ঈমান আনয়ন করে নি। বরং এর পরিবর্তে তাঁকেই পথভ্রষ্ট করার চক্রান্ত করে বসে এবং এক পাহাড়ের শৃঙ্গে নিয়ে গিয়ে পার্থিব সম্পদের লালসা দেখায় আর অঙ্গীকার করে সেজদা করলেই এই সকল সম্পদ তোমাকে প্রদান করব। শয়তানের এই মন্তব্যের মধ্যে বাস্তবেই এক বড়ো ভবিষ্যদ্বাণী ছিল এবং এ কথার প্রতি ইঙ্গিতও ছিল যে, খ্রিস্টান জাতি যখন তার সেজদা করবে তখন যাবতীয় পার্থিব সম্পদ তাদের প্রদান করা হবে। সুতরাং বাস্তবে এমনটাই প্রকাশিত হতে দেখা যায়। যাদের পথপ্রদর্শক খোদা নামাঙ্কিত হওয়া সত্ত্বেও শয়তানের অনুসরণ করে, অর্থাৎ তার পশ্চাদ্ধাবন করে তাহলে শয়তানের সেজদা করার বাকি আর কি রইল? সুতরাং খ্রিস্টানদের সম্পদ বস্তুতঃপক্ষে শয়তানের উদ্দেশ্যে করা ঐ সেজদারই প্রতিফল। স্পষ্ট প্রতীয়মান বিষয় হল, শয়তানি অঙ্গিকারানুযায়ী সেজদার পর খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে পার্থিব সম্পদ প্রদান করা হয়েছে। লেখক

আরও একটি বিপদের সম্মুখীন হতে হয় তা হল, গবেষণা দ্বারা ক্রুশবিদ্ধ ব্যক্তির কোন কার্যকারিতা প্রমাণিত হয় না এবং তাকে ক্রুশবিদ্ধ করার কোন ফলাফল বাস্তবায়িত হয়না। কেননা এটি কেবল দুই প্রকারেই হতে পারে–

(১) প্রথমতঃ সেই প্রয়াত পুত্রের ক্রুশবিদ্ধের মূল উদ্দেশ্য যদি এইরূপ ধার্য করা হয় যে, এতদ্বারা যেন তার মান্যকারীদেরকে পাপাচারে দুঃসাহসী করে তুলবে এবং তাঁর প্রায়শ্চিত্তবাদকে ভিত্তি করে চরম মাত্রায় পাপাচার, দুর্বৃত্ততা সহ সকল প্রকার নোংরামিকে প্রসারতা দান করবে। অতএব এই পদ্ধতি তো একেবারেই অযৌক্তিক ও শয়তানি পন্থা। আর আমার ধারণায় পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি নেই যিনি এই নৈরাজ্যকর পন্থাকে স্বীকৃতি প্রদান করবেন এবং এমন কোন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাকে পবিত্র বলে আখ্যায়িত করবেন যিনি জনসাধারণকে এরূপ সার্বিক পাপাচারে লিপ্ত হতে উৎসাহ প্রদান করেছেন। বরং অভিজ্ঞতা এ কথাই বলে যে, এমন ফতোওয়া সেই ব্যক্তিই প্রদান করবে যে প্রকৃতার্থে ঈমান ও সদাচরণ হতে বঞ্চিত হয়ে নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অন্যদেরকে নোংরামিতে লিপ্ত করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে এরূপ ব্যক্তিবর্গ সেই সকল জ্যোতিষীদের ন্যায় যারা প্রকাশ্যে রাস্থায় বসে পথচারীদেরকে প্রবঞ্চিত ও প্রতারিত করে এবং এক এক পয়সার বিনিময়ে নির্বোধ বেচারাদেরকে বড়ই সন্তুষ্টিজনক বাক্য দ্বারা সুসংবাদ প্রদান করে থাকে। যেমন খুব শীঘ্রই আপনার এই এই ভাগ্য খুলে যাবে এবং একজন যথেষ্ঠ বিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় মুখ ভঙ্গি করে হস্তরেখা ও চেহারার ছাপ ও অভিব্যক্তিকে খুবই সুচারু দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে যেন সে কিছু লক্ষণাবলী অনুসন্ধান করছে। অতঃপর প্রতারণার উদ্দেশ্যেই তার সম্মুখে রাখা একখানা চাকচিক্যময় পুস্তকের পৃষ্ঠা উল্টে পাল্টে বিশ্বাস প্রদান করে যে, বাস্তবেই (ভাগ্য) জানতে চাওয়া ব্যক্তির এক বড়ো ভাগ্য রাশি চমকিত হবে। এর ফলে সে হয়তো কোন দেশের রাজা হয়ে যাবে নতুবা মন্ত্রিত্ব তো অবশ্যই ধরা বাঁধা। এই সকল ব্যক্তিরা মানুষের নোংরামিতে নিমজ্জিত হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে খোদার অনুগ্রহভাজনদের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়। সেই অ্যালকেমিস্ট গুরুর ন্যায়,

যে সাদাসিধে অথচ্ সম্পদশালী ব্যক্তিকে দেখে নিজের কথার জালে ফাঁসাতে চায় এবং বিভ্রান্তিমূলক কথা-বার্তা বলে পূর্বে আগমনকারী অ্যালকেমিস্টদের তিরস্কার করতে শুরু করে দেয় যে, মিথ্যুক, দুর্বৃত্তরা অন্যায়ভাবে ধোঁকা দিয়ে মানুষদের সম্পদ হরণ করে নিয়ে গেছে। অবশেষে ধীরে ধীরে কথা এক পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে বলে, মহাশয় আমি আমার পঞ্চাশ-ষাট বছর বয়সে যত অ্যালকেমিস্টের দাবিদারকে দেখেছি সর্বদা তাদেরকে প্রবঞ্চক পেয়েছি। তবে হ্যাঁ, আমার পরম গুরু বৈকুণ্ঠবাসি ছিলেন সত্যিকারের রসায়নবিদ এবং তিনি কোটি কোটি টাকা দান করে গেছেন। সৌভাগ্যক্রমে আমি বার বছর যাবত্ তাঁকে সেবা করার সৌভাগ্য পেয়েছি এবং ফলও অর্জন করেছি। ফল অর্জনের নাম শুনে অজ্ঞ ব্যক্তি বলে ওঠে, বাবাজি তাহলে তো আপনি অবশ্যই গুরুজির নিকট হতে রাসায়ন বিদ্যা অর্জন করেছেন। একথা শুনে বাবাজি সামান্য কপট অসন্তুষ্ট হয়ে অহঙ্কারসূচক ভঙ্গিতে বলে, মিঞাঁ এ কথা মুখেও আনবেন না, হাজার হাজার মানুষ জমা হয়ে যাবে। আমি তো জনসাধারণ হতে মুখ লুকিয়ে বেড়াই। যাইহোক স্বল্প বাক্যেই নির্বোধ জালে ফেঁসে যায়। অতঃপর জালে জড়িয়ে পড়া শিকার জবাই করার অপেক্ষা মাত্র। আলাদা ডেকে চুপিসারে বোঝায়, বাস্তবে তোমারই সৌভাগ্য আমাকে হাজার হাজার ক্রোশ দূর হতে টেনে এনেছে। একারণে আমি নিজেই হতবাক যে, কিভাবে এই কঠিন হৃদয় তোমার জন্য নরম হয়ে গেল! বিলম্ব করবে না। এখনই ঘর থেকে অথবা ধার স্বরূপ দশ হাজারের স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে এসো। এক রাতেই দশ গুন বর্ধিত হয়ে যাবে। কিন্তু সাবধান! কারোর নিকট আমার উল্লেখ করবে না, অন্য কোন বাহানায় নিয়ে আসবে। অবশেষে সে সমস্ত অলঙ্কারাদি নিয়ে চম্পট দেয়। আর এদিকে এই উন্মাদ দশ গুন পাওয়ার লালসাকারী সারা জীবন কাঁদতে থাকে। এটি হল সেই প্রাকৃতিক নিয়মকে উপেক্ষা করে চরম সীমায় পৌঁছানোর লালসার পরিণাম। অধিকন্তু আমি শুনেছি এই সব প্রবঞ্চকদের অবশ্যই বলতে হয়, আমার পূর্বে যতজন এসেছে অথবা আমার পর যারা আসবে অবশ্যই তারা সকলে ঠগ, প্রতারক,অপবিত্র ও মিথ্যুক এবং এই বিদ্যা সম্পর্কে তারা একেবারেই

অজ্ঞ। তদ্রুপ তারাও যতক্ষণ পর্যন্ত আদম হতে সকল পূত পবিত্র নবীগণকে পাপাচারী ও ব্যাভিচারী প্রমানিত না করবে ততক্ষণ খ্রিস্ট সম্প্রদায়ের (বিশ্বাসের) ভিত ঠিক মজবুত হবে না।*

(২) দ্বিতীয়তঃ উক্ত করুণাযোগ্য পুত্রের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার দ্বিতীয় অবস্থা হল এই যে, তার ক্রশীয় মৃত্যুর মূল উদ্দেশ্য যদি এরূপ ধার্য করা হয় যে, তার এহেন মৃত্যুর প্রতি ঈমান আনয়নকারীরা সকল প্রকার পাপাচার ও কুকর্ম থেকে রক্ষা পাবে এবং প্রবৃত্তির কামনা বাসনা প্রকাশ পাবে না। কিন্তু পরিতাপ! যেরূপে প্রথম অবস্থা শালীনতা ও সভ্যতা বিবর্জিত এবং সর্বোতভাবে ভুল প্রমাণিত হয়েছে তদ্রূপ এই অবস্থাও প্রকাশ্যে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কেননা, যদি ধরে নেওয়া হয় যে, যীশুর কাফ্ফারার প্রতি বিশ্বাস আনয়ন করার মধ্যে এমন বিশেষত্ব রয়েছে যে, তার প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস স্থাপনকারী ফেরেশ্তাসুলভ চরিত্রের অধিকারী হয়ে যায়, অতঃপর তার হৃদয়ে পাপের ধারণার উদ্রেকও হয় না। তাহলে এমতাবস্থায় বিগত সকল নবীগণের সম্পর্কে বলতে হবে, তাঁরা যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যু ও কাফ্ফারার প্রতি প্রকৃত ঈমান আনয়ন করেন নি। কেননা, খ্রিস্টানদের ধারণা অনুযায়ী তাঁরা তো কুকর্মে সীমা অতিক্রম করেছেন। তন্মধ্যে কেউ মূর্তিপূজা করেছেন, আবার কেউ নিষ্পাপের খুন করেছেন, আবার কেউ নিজ কন্যার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছেন আর বিশেষ করে যীশুর পিতামহ দাউদ তো সকল প্রকার পাপাচারে লিপ্ত হয়েছেন। তিনি স্বীয় জৈবিক চাহিদা নিবারণের উদ্দেশ্যে এক নিরাপরাধকে প্রতারণামূলকভাবে হত্যা করান, বারাঙ্গনাদের পাঠিয়ে তাদের স্বামীদের ডেকে পাঠান এবং তাদেরকে মদ পান করান অতঃপর তাদের সঙ্গে যৌন সম্ভোগ করেন। বহু সম্পদ কুকর্মে নষ্ট করেন। সারা জীবনে তার একশত স্ত্রী ছিল। খ্রিস্টানদের

* টীকা: খ্রিস্টানদের বুদ্ধি ও বিবেচনার প্রতি পরিতাপ! তারা যীশুকে খোদা বানিয়ে তাঁর সত্তাকে কোনভাবেই উপকৃত করেনি। বরং সাধু-সজ্জন ব্যক্তিদের সম্মুখে তাঁকে লাঞ্ছিত করেছে। উচিত ছিল তাঁর আত্মার শান্তির জন্য সাদকা প্রদান করা ও দোওয়া করা যাতে তাঁর পরকাল ভালো হয়। নশ্বর জীবনকে খোদা বানিয়ে কি অর্জন হয়েছে? লেখক

মতে এই কাজটিও তার ব্যভিচারের অঙ্গ ছিল। অদ্ভুত বিষয় হল, প্রত্যহ রুহুল কুদ্দুস (ফেরেশতা) তার উপর অবতীর্ণ হত এবং বড় সক্রিয়ভাবে 'যবুর' অবতীর্ণ হচ্ছিল। আফসোস! না রুহুল কুদ্দুস আর নাই বা যীশুর কাফ্ফরার প্রতি ঈমান আনয়ন তাকে অপবিত্রতা হতে বিরত রাখতে সক্ষম হয়েছে। পরিশেষে ঐ দুষ্কর্মরত অবস্থায় তার অবসান ঘটে। এ হতে আরও বিস্ময়কর বিষয় হল, এই কাফ্ফারা যীশুর দাদি-নানিদেরকেও পর্যন্ত অশালীনতা হতে রক্ষা করতে পারেনি। যদিও তাদের এই অশালীনতার স্বরূপ যীশুর ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল গুণমানকে কলঙ্কিত করেছে। আর এই ধরণের দাদি নানির সংখ্যা কেবল এক দুই নয় বরং তিন জন। এইভাবে যীশুর এক 'নানি' (মাতামহী-অনুবাদক) যে এক সম্পর্কে তার 'দাদি'ও (পিতামহী-অনুবাদক) ছিল অর্থাৎ রাহাব , পতিতা অর্থাৎ সে ছিল একজন বারাঙ্গনা। (দেখুন, ঈশু ২:১)। তাঁর অপর এক নানি যে এক সম্পর্কে দাদিও ছিল, যার নাম ছিল তুমার। সে ঘরোয়া পরিবেশে দুশ্চরিত্রা নারীদের ন্যায় অবৈধ কর্মে লিপ্ত ছিল। (দেখুন, জন্ম খণ্ড ৩৮:১৬-৩০)। যীশুর আর এক নানি যে এক সম্পর্কে দাদিও ছিল, সে বিনতে সাবা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এই সেই সৎকর্মপরায়ন মহিলা, দাউদের সঙ্গে যে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছিল*। (দেখুন, ২'য় সামুঈল ১১:২)।

একথা স্পষ্ট যে, ঐ দাদি-নানিদেরকে অবশ্যই যীশুর কাফ্ফারা সম্পর্কে অবগত করানো হয়েছিল এবং তারা অবশ্যই ঈমান আনয়ন করেছিল। কেননা এটিই তো খ্রিস্ট ধর্মের মূল নীতি যে,পূর্বের সকল নবীগণ ও তাঁদের উম্মতকেও এই শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল এবং এর উপর ঈমান আনয়ন করে তাঁরা মুক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অতএব যীশুর

* টীকা: আমাদের নেতা ও মনিব আঁ হযরত (সা.) বলেন, আমার মা থেকে শুরু করে হাওয়া পর্যন্ত আমার মাতৃকুলের কোন মহিলাই দুষ্ট ও ব্যভিচারিনী নন আর না কোন পুরুষ ছিলেন দুষ্ট ও ব্যভিচারি। কিন্তু খ্রিস্টানদের নিজস্ব বক্তব্য অনুযায়ী তাদের খোদার জন্মের পিছনে তিন ব্যভিচারিণী মহিলার রক্ত মিশ্রিত হয়েছে। যদিও ব্যভিচারিণী মহিলার সন্তান সম্পর্কে তওরাতে বর্ণিত বিষয় কোন ব্যক্তির অজানা নয়। লেখক

ক্রুশীয় মৃত্যুর প্রভাব স্বরূপ যদি মনে করা হয় যে, তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যুতে ঈমান আনয়ন করলে মানুষ পাপাচার হতে রক্ষা পাবে, তাহলে যীশুর দাদি এবং নানিগণেরও ব্যভিচার ও নিষিদ্ধ কর্ম হতে সুরক্ষিত থাকা উচিত ছিল। কিন্তু খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী সকল পয়গম্বর যীশুর আত্মহত্যায় ঈমান আনয়ন করেছিলেন তথাপি তাঁরা দুষ্কর্ম হতে বিরত থাকতে পারেন নি। আর নাই বা যীশুর দাদি ও নানিরা এ হতে সুরক্ষিত ছিল। সুতরাং এ সব হতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এই **মিথ্যা প্রায়শ্চিত্তবাদ** কোন ব্যক্তিরই জৈবিক কামনা-বাসনা হতে বাঁচাতে অক্ষম। স্বয়ং মসীহ্‌কে বাঁচাতে পারে নি। দেখুন কেমন তিনি শয়তানের পশ্চাদানুসরন* করেছিলেন। যদিও তাঁর যাওয়া উচিত হয়নি। সম্ভবত

* টীকা: বর্তমানে ইউরোপীয় দার্শনিকগণ খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও এ কথা বিশ্বাস করেন না যে, বাস্তবেই শয়তান যীশুকে প্রবঞ্চনাবশতঃ পাহাড় শৃঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। কেননা তারা আকার বিশিষ্ট শয়তানের বিশ্বাসে বিশ্বাসী নয়। বরং তারা শয়তানি সত্তাকেই অস্বীকার করে থাকে। কিন্তু ঐ সমস্ত দার্শনিকদের চিন্তাধারাকে এক পাশে রাখলে অবশ্যই আরও একটি আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, শয়তানের সাহচার্যতার এই ঘটনা যদি ইহুদিদের পাহাড় এবং তাদের চলতি পথে ঘটে থাকত তাহলে যীশুর সঙ্গে অনেক ইহুদিরাও শয়তানকে দেখতে পেত। শয়তান নিশ্চয় কোন সাধারণ মানুষের মতো হবে না। বরং এক বিভৎস্য চেহারার প্রাণী হবে যা প্রত্যক্ষদর্শীদের বিস্মিত করবে। সুতরাং যীশু যদি শয়তানকে বাস্তবে খালি চোখে দেখে থাকেন তাহলে তা দেখে হাজার হাজার ইহুদি এবং অন্যান্যদের সেখানে জমা হওয়া ও এক বিশাল জনপদের সমাবেশ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তবে এমনটা ঘটেনি। একারণে ইউরোপীয় গবেষকগণ একে বাহ্যিক কোন ঘটনা স্বীকার করতে পারেন না। বরং এটি ইশ্বরত্বের দাবির ন্যায় সে প্রকারেরই এক ভ্রান্ত চিন্ত-ভাবনার ফসল তাই তারা ইঞ্জিলকে দূর হতেই সালাম জানায়। বর্তমানে এক ইউরোপীয় পন্ডিত খ্রিস্টানদের পবিত্র ইঞ্জিল সম্পর্কে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করে বলেন, আমার মতে কোন বিচক্ষণ মানুষের নিকট ইঞ্জিল একটি মনুষ্য নির্মিত বরং বিচার-বিবেচনাহীন সৃষ্টি এ কথা বিশ্বাস প্রদানের জন্য কেবল এতটুকুই যথেষ্ট যে, তারা ইঞ্জিলকে পড়ে দেখুন। অতঃপর এই সাহসী পুরুষ বলেন, আপনি ইঞ্জিলকে অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় পাঠ করুন। অন্যান্য পুস্তককে যেমন মনে করেন একেও ঠিক তেমনই মনে করুন। আপনার

এই আচরণের জন্যই তিনি এমন লজ্জিত হয়েছিলেন। যখন একজন ব্যক্তি তাকে সৎ বলে অভিহিত করে তখন তিনি তাকে বাধা দেন যে,

অবশিষ্ট টীকাঃ

চোখ হতে শ্রদ্ধার বাঁধন নামিয়ে ফেলুন আর নিজ হৃদয় হতে ত্রাসের ভীতি দূর করুন এবং মনকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে তুলুন। অতঃপর পবিত্র ইঞ্জিল পাঠ করুন। আপনি বিস্মিত হবেন, কিভাবে আপনি এই অজ্ঞতা ও অনাচারের রচিয়তাকে বুদ্ধিমান, সৎ ও পূত পবিত্র মনে করেছিলেন! সেভাবে বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞাত বহু দার্শনিক ইঞ্জিলকে ঘৃণার চোখে দেখে থাকেন। আর তারা এর অপবিত্র শিক্ষার জন্য বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছেন*। যার প্রতি আস্থা রাখা এক বিচক্ষণ ব্যক্তির জন্য চরম লজ্জাজনক বিষয়। যেমন এই একটি মিথ্যা কাহিনী যে, ক্রোধে অগ্নিশর্মা এক পিতা যে সকলকে ধ্বংস করতে চায় আর তার এক অতীব দয়ার্দ্র পুত্র যে জনসাধারণকে পিতার রোষানল থেকে দূরে রাখার জন্য ফাঁসিকাঠে ঝুলে গেল। এখন বেচারা ইউরোপীয় গবেষকগণ এমন ভ্রান্ত কল্প-কাহিনীকে কিভাবেই বা মান্যতা প্রদান করবেন? অনুরূপভাবে খ্রিস্টানদের অজ্ঞতাপূর্ণ ধারণা খোদাকে তিনটি দেহে বিভক্ত করেছে। একটা হল সেই যা সর্বদা মানবরূপে বিদ্যমান থাকবে। এর নাম হল, ইবনুল্লাহ্ (খোদার পুত্র)। সর্বদা বিদ্যমান পায়রারূপি দ্বিতীয় দেহের নাম হল, রুহুল কুদ্দুস (পবিত্র আত্মা)। আর তৃতীয় দেহ যার ডানপার্শ্বে গিয়ে পুত্র বসে আছে। এখন একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি এই ত্রিতনু বিশিষ্ট খোদার প্রতি কিভাবে আস্থা রাখবে? যদিও শয়তানের যাত্রা সঙ্গি হওয়ার অভিযোগ ইউরোপীয় দার্শনিকদের নিকট কম বিদ্রুপের কারণ নয়। বহু প্রচেষ্টার পর ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় যে, এসব অবস্থা আসলে যীশুর মস্তিষ্কে উদ্ভব এক প্রকারের ধারণা মাত্র। সেই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করে যে, সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় এমন অনর্থক চিন্তার উদ্রেক হতে পারে না। অনেকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

* নোট: খ্রিস্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি দর্শনের যত উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায় ততই ইঞ্জিল ও খ্রিস্ট ধর্মের প্রতি তার মোহভঙ্গ হতে থাকে। এমন কি বর্তমানে এক মেম সাহেব খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের খন্ডন স্বরূপ এক পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু মুসলমান দার্শনিকদের এর বিপরীত অবস্থা। বু আলী সিনা যিনি প্রখ্যাত দার্শনিক এবং বিধর্মী ও পথভ্রষ্ট বলে পরিচিত, তিনি স্বীয় পুস্তক 'ইশারাত' এর পরিশেষে লেখেন, যদিও দৈহিক পুনরুত্থানের সমর্থনে দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং এর বিপরীত মতপোষণ করে। অধিকন্তু যেহেতু সত্য সংবাদদাতা রসূল করীম (সা.) এ কথা নিশ্চিত করেছেন সেহেতু আমরা এর উপর ঈমান আনয়ন করি। লেখক

আমাকে কেন সৎ বলছ? বাস্তবেই আমি এমন এক ব্যক্তি যে শয়তানের পশ্চাদানুসরণ করেছে সে কিভাবে নিজেকে সৎ আখ্যায়িত করার সাহস প্রদর্শন করতে পারে? একথা নিশ্চিত যে, যীশু মসীহ্ নিজ ধারণায় এবং আরও কতিপয় বিষয়ের কারণে নিজেকে সৎ আখ্যায়িত করা হতে এড়িয়ে চলতেন। কিন্তু আফসোস! খ্রিস্টানগণ তাঁকে কেবল সৎ আখ্যাই

অবশিষ্ট টীকা:

হল যে, মৃগী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি অধিকাংশ সময় এভাবেই শয়তানকে দেখে থাকে এবং হুবহু এমনই বর্ণনা করে যে, শয়তান তাকে অমুক অমুক জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল এবং এই এই অলৌকিকতা দেখিয়েছে। আমার মনে আছে প্রায় চৌত্রিশ বছর পূর্বে আমি এক স্বপ্নে দেখি, কালো ও কুৎসিত শয়তান এক স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। সর্বপ্রথম সে আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। আমি তার মুখে চপেটাঘাত করে বলি, দূর হ' শয়তান, আমার নিকট তোর কোন স্থান নেই। অতঃপর সে অন্য এক ব্যক্তির নিকট যায় ও তাকে সঙ্গী করে নেয়। সেই ব্যক্তিকে আমি জানতাম যাকে সে সঙ্গী করে নিয়েছিল। এরপর আমার চোখ খুলে যায়। স্বপ্নে দেখা শয়তানের সহচর ব্যক্তি সেই দিন অথবা তার পর থেকে মৃগী রোগে আক্রান্ত হয় এবং মৃগী রোগে ভুগতে থাকে। এ হতে আমার বিশ্বাস জন্মায়, শয়তানের সহযাত্রী হওয়ার ব্যাখ্যা (তা'বীর) হল মৃগী রোগ। অতএব অতি সূক্ষ্ম ও স্পষ্ট যৌক্তিক সিদ্ধান্ত হল, যীশু মসীহ্ বাস্তবেই মৃগী রোগে আক্রান্ত ছিলেন। এ কারণেই তিনি এমন স্বপ্ন দেখতেন। ইহুদিদের অভিযোগ ছিল, তুমি বা'ল যবুল (শয়তানের নাম-অনুবাদক) এর সাহায্যে এমন কাজ কর্ম করছ। এই রায়ের সমর্থনও খুবই সন্তুষ্টি জনক। কেননা, বা'ল যবুল হল একটি শয়তানের নাম। ইহুদিদের মন্তব্য একারণে সঠিক ও প্রায় এর ধারে কাছে বলে মনে হয় যে, যারা শয়তানের প্রভাবে চরম প্রভাবিত হয়ে পড়ে, শয়তান তাদের ভালবাসতে শুরু করে। তখন তাদের মৃগী ইত্যাদি ভালো হয় না। কিন্তু অন্যান্যদের মুক্ত করতে পারে। কেননা, শয়তান তাদের ভালবাসে এবং তাদের থেকে পৃথক হতে চায় না। অধিক ভালবাসার কারণে তাদের কথা শোনে। তাদের কথায় অন্যদের শয়তানি ব্যাধি সমূহ হতে মুক্তি দেয়। এমন ব্যক্তি সর্বদা মদ ও অন্যান্য নোংরা বস্তু ব্যবহার করে থাকে এবং চরম মাপের মদ্যপ ও পেটুক হয়ে থাকে। কিছু দিন পূর্বেই এক ব্যক্তি অচৈতন্যতার ব্যাধিগ্রস্থ হয়েছিল। তার সম্পর্কে বলা হয়, সে অন্যান্য মানুষদের জিন্ন ও ভূত ছাড়িয়ে বেড়ায়। অতএব যীশুর এই শয়তানি

দেয়নি বরং খোদার স্থলাভিষিক্ত করেছে। যাইহোক কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্তবাদ) মসীহ্র সত্তাকেও কোনপ্রকার কল্যাণ পৌঁছাতে পারেনি এবং সকল পাপের উৎস অহঙ্কার ও দাম্ভিকতা যীশু মসীহ্ সাহেবের ঝুলিতে এসে পড়েছিল বলে মনে হয়। কেননা তিনি নিজে খোদা সেজে সকল নবীকে দস্যু, প্রতারক ও অপবিত্র মানুষ বলে আখ্যা দিয়েছেন। যদিও তাঁর এ স্বীকারোক্তি হতে প্রকাশ পায় যে, তিনি নিজেও পবিত্র নন। কিন্তু পরিতাপ! আত্মম্ভরিতার বন্যা তাঁকে ধ্বংস করেছে। কোন ভদ্র মানুষ বিগত বুজুর্গগণকে তিরস্কৃত করেন না। কিন্তু এই ব্যক্তি তো পবিত্র নবীগণকে দস্যু, প্রতারক নামে আখ্যায়িত করেছেন।

অবশিষ্ট টীকা ঃ

সাহচার্যতার ঘটনা তার মৃগী আক্রাত হওয়াকে স্পষ্ট প্রমাণ করে। আমার নিকট আরও অনেক প্রমাণ রয়েছে যার ব্যাখ্যা লেখার এখন প্রয়োজন নেই। আশা করি, আমার সঙ্গে পূর্বেই সহমত পোষণকারী খ্রিস্টান গবেষকগণ অস্বীকার করবেন না। অপরদিকে যে সকল অজ্ঞ পাদরীগণ অস্বীকার করবেন তাদেরকেই প্রমাণ করতে হবে যে, যীশু মসীহ্র শয়তানের সহযাত্রী হওয়া প্রকৃতপক্ষে জাগ্রত অবস্থার একটি ঘটনা* এবং মৃগী রোগের কারণে নয়। প্রমাণস্বরূপ এমন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য উপস্থাপন করতে হবে যা সেই বিবৃতির সপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে। পায়রার অবতরণ ও তুমি আমার প্রিয় পুত্র বলাটাও বস্তুতপক্ষে মৃগীর আক্রমণ বলে মনে হয়। যদ্দরুন এরূপ চিন্তা ভাবনার উদয় হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পায়রার রঙ সাদা হয় আর শ্লেষ্মার রঙও সাদা হয়ে থাকে। আর মৃগীর উৎস হল শ্লেষ্মা। সুতরাং শ্লেষ্মাকেই তিনি পায়রার আকারে দেখেছিলেন। তুমি আমার প্রিয় পুত্র এ কথার গোপন রহস্য হল, মৃগী আক্রান্ত রোগী বাস্তবে মৃগীব্যধিরই পুত্র হয়ে থাকে। সেকারণে মৃগীকে চিকিৎসা বিদ্যায় উম্মুস্ সায়বান বলা হয় অর্থাৎ বাচ্চার মা। একদা যীশু মসীহ্র চার সহোদর ভাই তৎকালীন সরকারের নিকট আবেদন জানিয়েছিল, এই ব্যক্তি উন্মাদ হয়ে গেছে, এর কোন বন্দোবস্ত করা হোক। অর্থাৎ জেলে বন্দি করা হোক। সেখানকার রীতি অনুযায়ী, যেন তার চিকিৎসা করা হয়। অতএব এই আবেদনও একথা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, প্রকৃতপক্ষে যীশু মসীহ্ মৃগী ব্যধিতে অসুস্থতার কারণে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। লেখক

---

* প্রশ্ন হল, যীশু মসীহ্র সঙ্গে শয়তানকে কোন কোন ব্যক্তি দেখেছে?

অন্যদের সম্পর্কে তাঁর মুখে সর্বদা 'বেঈমান', 'হারামখোর' ইত্যাদি শব্দবন্ধ লেগেই থাকত। কারোর সম্পর্কে সম্মানজনক শব্দ ব্যবহার করেননি। কেনই বা হবে না, তিনি যে খোদার পুত্র! আসুন এবার দেখা যাক যীশু মসীহ্‌র কাফ্‌ফারা (প্রায়শ্চিত্তবাদ) তাঁর হাওয়ারীদের হৃদয়ে কি প্রভাব ফেলেছিল? তার উপর ঈমান আনয়ন করে তারা কী পাপাচার থেকে বিরত হয়েছিল? এখানেও যথার্থ পবিত্রতার স্থান শূন্য দেখা যাবে। এ কথা সত্য যে, তারা তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সংবাদ শুনে ঈমান আনয়ন করেছিল। তা সত্ত্বেও (ঈমান আনার) ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, যীশুর গ্রেফতার হওয়াতে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে পিতরস (তাঁর এক হাওয়ারী–অনুবাদক) অভিসম্পাত করে আর বাকি সকলে পলায়ন করে। কারোর হৃদয়ে বিশ্বাসের জ্যোতি অবশিষ্ট ছিল না। অতঃপর এ যাবৎ কাল পর্যন্ত পাপাচার হতে তাদের বিরত হওয়ার অবস্থা এই যে, বিশেষতঃ ইউরোপীয় গবেষকগণের স্বীকারোক্তি হতে একথা প্রমাণিত যে, ইউরোপে ব্যভিচার এত প্রবল আকার ধারণ করেছে যে, লন্ডনে প্রতি বছর হাজার হাজার অবৈধ সন্তানের জন্ম হয়। ইউরোপে এমন নোংরা ঘটনাবলী প্রকাশিত হয়েছে যা বলা ও শোনার অযোগ্য। মদ্য পানের আসক্তি এতটাই প্রবল যে, যদি উক্ত দোকানগুলিকে এক লাইনে পরপর রাখা হয় তাহলে এক পথচারি দুই মঞ্জিল পথ যাত্রা করলেও দোকান শেষ হবে না। মানুষ ইবাদত হতে বিরত থেকে দিন রাত বিলাসিতা ও পার্থিব চাহিদা পূরণে নিমজ্জিত। এই সকল গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যীশু মসীহ্‌র ক্রুশীয় মৃত্যুতে ঈমান আনয়নকারীরা পাপ হতে বিরত হতে পারে নি।* বরং বাঁধ ভেঙে যাওয়ার কারণে যেমন দ্রুত গতিতে প্রবাহিত নদীর জল আশে পাশের গ্রামগুলিকে

* টীকা: যীশু মসীহ্‌র ক্রুশবিদ্ধ হওয়া যদি স্বেচ্ছায় হয়ে থাকে তাহলে এটি হবে আত্মহত্যা ও অবৈধ মৃত্যু। আর অনিচ্ছায় হয়ে থাকলে কাফ্‌ফারা বা প্রায়শ্চিত্তবাদ বলে পরিগণিত হবে না। যীশু একারণে নিজেকে সৎ আখ্যায়িত করতে পারেন নি যে, কারণ মানুষ জানত, এই ব্যক্তি মাদকাসক্ত এবং এই বিপথগামীতা ঈশ্বরত্ব অর্জনের পর নয় বরং প্রাথমিক কাল হতেই তাঁর সঙ্গে বিদ্যমান বলে মনে হয়। সুতরাং ঈশ্বরত্বের দাবি মদ্য পানের এক কুফল মাত্র। লেখক

প্লাবিত করে। ঠিক তেমনই কাফ্ফারার প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের অবস্থা। আমি জানি খ্রিস্টান মহোদয়গণ এ ব্যাপারে অধিক বাক্ বিতণ্ডা করবেন না। কেননা, ওই নবীগণকে যাদের উপর খোদার ফেরেশ্তা অবতীর্ণ হত, যীশুর কাফ্ফারা যখন তাদেরকে কুকর্ম হতে বিরত রাখতে পারে নি, তখন ব্যবসায়ী, পেশাদার ও নামধারী পাদরীদেরকে কিভাবে কুকর্ম হতে বিরত রাখবে? যাইহোক এই হল খ্রিস্টানদের খোদার অবস্থা যা আমি এখনই বর্ণনা করলাম।

এখনই বর্ণনাকৃত দুই ধর্মের প্রতিপক্ষতায় তৃতীয় ধর্ম হল, ইসলাম। এই ধর্মে খোদা অন্বেষণের পন্থা অতীব স্পষ্ট ও মনুষ্য স্বভাবজ গুণসম্পন্ন। এমনকি যদি অন্য সব ধর্মের পুস্তকগুলি বিনষ্ট হয়ে যায় ও তাদের যাবতীয় শিক্ষার রীতি ও পদ্ধতি নিশ্চিহ্নও হয়ে যায়, তথাপিও কুরআন যে খোদার প্রতি দিকনির্দেশনা প্রদান করে, প্রকৃতির দর্পনে তাঁকে স্পষ্ট দেখতে পাবেন এবং তাঁর মাহাত্ম্য ও প্রজ্ঞাপূর্ণ চেহারা প্রতিটি অনু-পরমানুর মাঝে উজ্জ্বল প্রতিবিম্বিত হতে দেখা যাবে। মোটকথা কুরআন শরীফ যে খোদার হদিস দেয় তিনি স্বীয় সৃষ্টির উপর কেবল শাস্তি প্রদানের ক্ষমতাই রাখেন না। বরং কুরআন শরীফের আয়াত اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى (অর্থ আমি কী তোমাদের রব নই? তারা বলল, অবশ্যই আপনি আমাদের রব- অনুবাদক, সূরা আল্ আরাফ 7:173) অনুসারে প্রত্যেক অণু-পরমাণু নিজ প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিক গুণানুসারে তাঁর আজ্ঞাবাহি এবং প্রতিটি উপাদানের মাঝে তাঁর প্রতি বিনত হওয়ার এক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আর কোন অণু-পরমাণুও এই বৈশিষ্ট্য হতে বঞ্চিত নয়। প্রত্যেক বস্তুর তিনিই (একমাত্র) সৃষ্টিকর্তা এটিই তার একটি বড় প্রমাণ। কেননা প্রত্যেক জ্যোতির্ময় হৃদয় একথা স্বীকার করেন যে, সকল বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান তাঁর প্রতি অবনত হওয়ার স্বভাবজ বৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহে তাঁর পক্ষ থেকেই প্রদেয়। যেরূপে কুরআন শরীফের এই আয়াত এদিকে ইশারা করে বলে, اِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ (বনী ইসরাঈল 17:45) অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে চলেছে। খোদা যদি তাদের সৃষ্টিকর্তা

না হতেন তাহলে তাঁর প্রতি আকর্ষিত হওয়ার বৈশিষ্ট্য কেনই বা পরিলক্ষিত হত? একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি অবশ্যই একথা স্বীকার করবেন যে, কোন গোপন সম্পর্কের কারণে হয়ত এই আকর্ষণ। অতএব এই সম্পর্ক যদি সৃষ্টিকর্তা খোদার না হয়ে থাকে তাহলে কোন আর্য সমাজী উত্তর দিন যে, বেদ ইত্যাদিতে এই সম্পর্কের স্বরূপ কী বর্ণনা করে এবং এর নাম কী? এটাই কি সত্য যে, খোদাতা'লা কেবল বলপূর্বক সকলের উপর শাসনকার্য চালাচ্ছেন এবং খোদাতা'লার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কোন স্বভাবজ বৈশিষ্ট্য ও আগ্রহ এই সকল বস্তুর মধ্যে আদৌ নেই? মা'যাল্লাহ্ (আল্লাহ্ ক্ষমা করুন- অনুবাদক) এমনটা কখনোই না। এমন চিন্তাভাবনা কেবল নির্বুদ্ধিতাই নয় বরং চরম নিম্ন মানের দুশ্চরিত্রও বটে। কিন্তু পরিতাপ! আর্যদের বেদ খোদাতা'লাকে সৃষ্টিকর্তারূপে অস্বীকার করে সেই আধ্যাত্মিক সম্পর্ককে অস্বীকার করেছে যার প্রতি স্বভাবজ অনুসরণ প্রত্যেক বস্তুর অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। যেহেতু ঐশী সূক্ষ্ম প্রজ্ঞা ও তত্ত্বজ্ঞান হতে তারা হাজার হাজার ক্রোশ দূরে অবস্থিত। সেহেতু এই সত্য দর্শন তাদের নিকট লুক্কায়িত ছিল যে, নিশ্চিতরূপে সেই আদি সত্তার সঙ্গে সকল দেহ ও আত্মার এক আত্মিক যোগসূত্র বিদ্যমান। খোদাতা'লার রাজত্ব কেবল বাহ্যিকতা ও বল প্রয়োগের শাসন ব্যবস্থা নয়। বরং প্রত্যেক বস্তু আত্মিকভাবে তাঁর সেজদায় অবনত। কেননা প্রত্যেক অণু পরমাণু তাঁর অসীম দয়ার সাগরে নিমজ্জীত ও তাঁর হস্ত দ্বারা নির্মিত। কিন্তু পরিতাপ! সকল বিরোধী ধর্মাবলম্বীরা তাদের সঙ্কীর্ণমনার কারণে খোদাতা'লার অসীম কুদরত, রহমত ও পবিত্রতাকে জোর পূর্বক রুদ্ধ করতে চেয়েছে। আর এ কারণেই তাদের কল্পিত খোদারা দুর্বলতা, অপবিত্রতা, কৃত্রিমতা, অহেতুক ক্রোধ, অনুপযোগী শাসন ব্যবস্থার ন্যায় বিভিন্ন প্রকার কলঙ্কে কলঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু ইসলাম ধর্ম খোদাতা'লার পরিপূর্ণ গুণাবলীর প্রবাহমান ধারাকে অব্যাহত রেখেছে। আর্যদের ন্যায় এরূপ শিক্ষা দেয় না যে, আকাশ ও পৃথিবীর আত্মা এবং প্রত্যেক বস্তুর অণু পরমাণুরা নিজেরাই নিজেদের খোদা। পরমেশ্বর অজানা কোন কারণে রাজা হয়ে বসেছে ও শাসন ক্ষমতা চালাচ্ছে। আর খ্রিস্ট ধর্মের ন্যায় এ শিক্ষা দেয়

না যে, খোদা মানুষের ন্যায় এক মহিলার গর্ভ হতে জন্ম গ্রহণ করেছে এবং সে বিনতে সাবা, তুমার এবং রাহাব এর ন্যায় ব্যভিচারিনীর প্রকৃতি হতে উদ্ভূত পাপিষ্ঠার গর্ভে কেবল নয় মাস পর্যন্ত রজঃস্রাব ভক্ষন করে নিজ প্রকৃতির মধ্যে ঔরসত্বের অংশীদার হয়ে রক্ত-হাড়-মাংস অর্জন করেছে। এমনকি শৈশবের রোগভোগ যেমন, গুটি বসন্ত ও দাঁতের যন্ত্রনা ইত্যাদির ন্যায় সব কষ্টও তাকে স্বীকার করতে হয়েছে। জীবনের অধিকাংশ সময় সাধারণ মানুষের ন্যায় অতিবাহিত করে অবশেষে মৃত্যুর নিকট পৌঁছে ঈশ্বরত্বের কথা মনে পড়েছে। কিন্তু যেহেতু এটা দাবিসর্বস্বই ছিল তৎসঙ্গে কোন ঐশী ক্ষমতা ছিল না সেহেতু এই দাবির সঙ্গে সঙ্গেই সে ধৃত হয়েছে। কিন্তু ইসলাম এই সকল বিপদাবলী, অপবিত্র অবস্থা হতে প্রকৃত মহিমান্বিত খোদাকে পূত পবিত্র জ্ঞান করে এবং সেই সুমহান সত্তাকে পাশবিক সেই ক্রোধের উর্দ্ধে বলে মনে করে যে, যতক্ষণ কারোর গলায় ফাঁসির দড়ি না পরাবেন ততক্ষণ স্বীয় বান্দাদের জন্য ক্ষমার কোন পথ তাঁর দৃষ্টিগোচর হয় না। বরং খোদাতা'লার সত্তা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে কুরআন শরীফ যথার্থ, পবিত্র ও পরিপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করে যে, তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী ও দয়াবান, সেই সাথে সীমাহীন পবিত্রতা ও মাহাত্ম্যের একমাত্র আধার। কুরআনি শিক্ষার আলোকে এ কথা বলা চরম অপছন্দনীয় পাপ যে, খোদাতা'লার এ হেন ক্ষমতা, মাহাত্ম্য এবং আশিস এক পর্যায়ে পৌঁছে স্তিমিত হয়ে যায় অথবা কোন এক অবস্থায় গিয়ে তাঁর দুর্বলতা বাঁধাপ্রাপ্ত হয় বরং এর বিপরীতে সেই সমস্ত বিষয়াবলী যা তাঁর পবিত্রতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণ গুণাবলীর পরিপন্থী অথবা তাঁর অপরিবর্তনীয় অঙ্গীকারসমূহের বিরোধী ব্যাতিরেকে তাঁর যাবতীয় কার্যাবলী সেই সুপ্রতিষ্ঠিত রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে যে, তিনি যা ইচ্ছে করতে পারেন। যেমন আমরা এ কথা বলতে পারি না যে, তিনি স্বীয় অসীম ক্ষমতা বলে নিজ সত্তাকে ধ্বংস করতে পারেন। কেননা এ কথা তাঁর আদি গুণ 'চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী'র বিরোধী। এর কারণ হল, তিনি পূর্ব হতেই স্বীয় কথা ও কাজে প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, তিনি আদি অনন্ত অবিনশ্বর এবং মৃত্যু তাঁর জন্য বৈধ নয়। তেমনই এ কথা ও বলা যাবে না যে, তিনি কোন

নারীর গর্ভে প্রবেশ করে, রজঃস্রাব রক্ত ভক্ষণ করে এবং প্রায় নয় মাস পূর্ণ করে শের বা দেড় শের ওজন ধারণ করে স্ত্রী যোনিপথ দিয়ে ক্রন্দনরত অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করবেন, অতঃপর রুটি (খাদ্য) খেয়ে, প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিয়ে, এই নশ্বর জীবনের সকল প্রকার দুঃখ-যাতনা ভোগ করবেন এবং অবশেষে কিছু মুহূর্ত মৃত্যু যন্ত্রনা সহ্য করে ইহলোক ত্যাগ করে চলে যাবেন। কেননা এই সকল বিষয় দোষ-ত্রুটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁর আদি গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী।

আবার একথাও জানা দরকার যে, ইসলামি শিক্ষানুযায়ী খোদাতা'লা হলেন সমগ্র সৃষ্টিকুলের সৃষ্টিকর্তা। আর কী'ই বা আত্মা আর কী'ই বা দেহ সব তাঁরই সৃষ্ট এবং তাঁরই ক্ষমতাবলে অস্তিত্ব ধারণ করেছে। সুতরাং এটিও একটি কুরআনি বিশ্বাস যে, খোদা যেমন প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা ও সূচনাকারী, তেমনই তিনি প্রত্যেক জিনিসের বাস্তব ও যথার্থরূপে স্থিতিদাতাও বটে। অর্থাৎ প্রত্যেক উপাদানের অস্তিত্ব টিকে থাকা তাঁর উপর নির্ভরশীল এবং তাঁর সত্তা সবকিছুর জন্য প্রাণস্বরূপ। তাঁর অস্তিত্বকে অস্বীকার করলে সকল প্রাণী ও বস্তু জগতের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে হবে। মোটকথা সকল প্রাণী ও বস্তু জগতের অস্তিত্ব টিকে থাকা এবং স্থিতিশীলতার জন্য তাঁর সম্পৃক্ততা অবশ্যক। কিন্তু আর্য ও খ্রিস্টানগণ এই বিশ্বাস পোষণ করেন না। আর্যদের এমন বিশ্বাস পোষণ না করার কারণ হল, তারা খোদাতা'লাকে আত্মা ও শরীরের স্রষ্টারূপে স্বীকার করে না এবং প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে তাঁর এমন সম্পর্ককে মানেই না যদ্বারা প্রমাণিত হবে যে, সকল প্রাণী ও বস্তু জগত তাঁরই অসীম শক্তি ও অভিপ্সার ফলশ্রুতি এবং তাঁর ইচ্ছাশক্তির ছায়াস্বরূপ। বরং সকল প্রাণী ও বস্তু জগতের অস্তিত্বকে এমনভাবে চিরস্থায়ী মনে করে যে, যা হতে বোঝা যায় তাদের ধারণা অনুযায়ী সকল প্রাণী ও বস্তু জগত স্বীয় সত্তায় চিরস্থায়ীরূপে আদি ও অনন্ত। অতএব বিদ্যমান এই সকল উপাদান যখন খোদাতা'লার অসীম মহিমা হতে সৃষ্টি হয়ে তাঁর কুদরতের সঙ্গে সহাবস্থান করে না তখন নিঃসন্দেহে এই সবকিছু হিন্দুদের পরমেশ্বর হতে এমনই সম্পর্কহীন যে, যদি তাদের পরমেশ্বরের মৃত্যুকে স্বীকার করে নেওয়া হয় তথাপি এই সকল আত্মা ও দেহের

কিছু যায় আসে না। কেননা তাদের পরমেশ্বর তো এক রাজমিস্ত্রীর ন্যায়। ঠিক যেমন রাজমিস্ত্রীর ব্যক্তিগত পারদর্শিতার কারণে ইঁট ও গারা (কাদা–মাটি) নিজ গুণে প্রতিষ্ঠিত নয় যে সর্বাস্থায় তার সত্তাকে অনুসরণ করে চলবে। তেমনই অবস্থা হিন্দুদের পরমেশ্বরের সঙ্গে বস্তু ও প্রাণীজগতের। এক রাজমিস্ত্রীর মৃত্যু হলে যেমন তাঁর দ্বারা নির্মিত সকল অট্টালিকা ভেঙ্গে পড়া আবশ্যক নয়। তেমনই এও আবশ্যক নয় যে, হিন্দুদের পরমেশ্বরের মৃত্যু হলে অন্যান্য উপাদান কোনরূপ প্রভাবিত হবে। কেননা, সে তাদের কাইউম* বা স্থিতিদাতা নয়। যদি কাইউম হত তাহলে অবশ্যই তাদের স্রষ্টা হত। কেননা, যে উপাদান নিজ সৃষ্টির জন্য ঐশী ক্ষমতার মুখাপেক্ষী নয়, সে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্যও সেই ক্ষমতার সাহায্যের কোন প্রয়োজন বোধ করে না। খ্রিস্টীয় বিশ্বাস অনুযায়ী তাদের সাকার খোদা বিশ্বজগতের কাইউম বা স্থিতিদাতা হতে পারেন না। কেননা, কাইউম হওয়ার জন্য সম্পৃক্ততা একান্ত প্রয়োজন। আর এটি তো স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, খ্রিস্টানদের খোদা যীশু মসীহ্ এখন পৃথিবীতে বিদ্যমান নেই। পৃথিবীতে যদি থেকে থাকতেন তাহলে অবশ্যই সকলে তাঁকে দেখতে পেত যেমন পিলাতের শাসনকালে তার সাম্রাজ্যে তাঁর উপস্থিতি দৃষ্টিগোচর হত। সুতরাং তিনি যখন পৃথিবীতে উপস্থিত নেই তখন কীভাবে ধরাপৃষ্ঠের কাইউম বা স্থীতিদাতা হতে পারেন? পড়ে রইল আকাশ, সুতরাং তিনি আকাশেরও খোদা নন। কেননা তাঁর মানবীয় শরীর তো প্রায় ছয় সাত বিঘত মাত্র, তাহলে সমগ্র আকাশে কীভাবে বিদ্যমান হতে পারেন যে তাদের কাইউম হবেন? কিন্তু আমরা খোদাতা'লাকে রব্বুল আরশ্ বলে থাকি। এর মানে এই নয় যে তিনি পার্থিব ও তাঁর শরীর রয়েছে এবং তিনি আরশের মুখাপেক্ষী। বরং আরশের অর্থ হল, পবিত্র সুউচ্চ স্থান যা ইহজগৎ ও পরজগতের সঙ্গে সমভাবে সম্পর্কযুক্ত। খোদাতা'লা আরশে অধিষ্ঠিত এ কথা বলার প্রকৃত অর্থ হল, তিনি দু'জাহানের বাদশাহ্। যেমন এক ব্যক্তি কোন উচ্চ স্থানে বসে অথবা সুউচ্চ মহলে উঠে চারপাশে নজর রাখে। তেমনই

* নোট: যে বস্তু ঐশী সহায়তায় সৃষ্টি হয়নি সে স্বীয় স্থীতিশীলতার জন্য ঈশ্বরের সাহায্যের মুখাপেক্ষীও নয়।

রূপকার্থে খোদাতা'লা উচ্চ থেকে উচ্চতর আসনে অধিষ্ঠিত বলে স্বীকার করা হয়েছে। তাঁর দৃষ্টি হতে না ইহজগতের আর না পরজগতের কোন কিছু গোপন আছে। হ্যাঁ, সেই স্থানকে সাধারণ বোধগম্যের জন্য উপরের দিকে বর্ণনা করা হয়। কেননা বাস্তবেই যেহেতু খোদাতা'লা সবার উপরে আর সকলেই তাঁর পদতলে পড়ে আছে, সেহেতু উপরের দিক তাঁর সত্তার জন্যই সু-সামঞ্জস্যপূর্ণ। অধিকন্তু উপরে তিনিই একমাত্র যাঁর অধীনে দু'জাহান অবস্থান করছে। আবার তিনি সেই পরম কেন্দ্র বিন্দুর ন্যায় যার তলদেশ হতে দুই মহা জগতের দুটি শাখা নির্গত হয়েছে। আর প্রত্যেক শাখা হাজার হাজার জগৎ সমন্বয়ে নির্মিত যার পূর্ণজ্ঞান সেই সত্তা ব্যতিরেকে আর করোর নেই। যিনি সেই পরম কেন্দ্রবিন্দুতে আরোহিত আছেন যার নাম হল আরশ। এ কারণেই সেই পরম কেন্দ্রবিন্দু বলে বাহ্যিকভাবেও উর্দ্ধগামী সেই মহান হতে মহানতম উচ্চতাকে জ্ঞান করা হয় যা উভয় জগতের উর্দ্ধে রয়েছে। এটিই শরিয়তের পরিভাষায় আরশ নামে খ্যাত। এই উচ্চতার ব্যাপকতা ঐশী সত্তার অসীম ক্ষমতার অনুরূপ। যেন একথার প্রতি ইশারা করে যে, তিনিই সকল কল্যাণের উৎস এবং সকল বস্তুর প্রত্যাবর্তন স্থল, তিনিই সকল সৃষ্ট জীবের উপাস্য এবং স্বীয় সত্তা, বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী এবং শ্রেষ্ঠত্বে সবার উর্দ্ধে। কুরআন বর্ণনা করে, তিনি সর্বত্রই বিরাজমান। যেমন,

فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ

যেদিকেই মুখ ফেরাও না কেন সেদিকেই খোদার চেহারা বিদ্যমান (আল্ বাকারা 02:116)।

هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ

অর্থাৎ তুমি যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমার সঙ্গে আছেন (আল্ হাদীদ 57:05)।

نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ

অর্থাৎ আমি মানুষের জীবন শিরারও নিকটে রয়েছি (কাফ 50:17)। এই হল তিন প্রকার শিক্ষার নমুনা।

ওয়াস্‌সালামু আলা মানিত্তাবাআল হুদা (সত্য পথের অনুসরণকারীর উপর শান্তি বর্ষিত হোক)।

বিনীত

১'লা ডিসেম্বর ১৮৯৫ ইং, রবিবার মির্যা গোলাম আহ্‌মদ

(আল্লাহ্‌ তাঁকে ক্ষমা করুন)